তন্মাত্র

সুভাষ ঘোষাল

অরুণা প্রকাশনী : কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৭০

প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
প্রবীর সেন
মুদ্রাকর
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৯

পনেরো বছর আগে কিছুদিনের জন্য একটি অধ্যায় গড়ে উঠেছিল। রাত থাকতে থাকতে জেগে উঠে ভোরবেলায় বেরিয়ে পড়া। এমনভাবে হাঁটা শুরু করা যাতে নিখিল নিদ্রার পটভূমিতে সরু সুবর্ণদাগ যেন স্থির হয়ে থাকে। সেসব দিনে বৃক্ষ ছিল, বৃক্ষের নিবিড় মধ্যস্থতা ছিল, জলস্থল ছিল এবং বৃক্ষ আর জলস্থলের পাশ দিয়ে ছিল রেলগাড়ি। গাড়ির স্বরে রূপ-রেখা ছিল। পনেরো বছর আগে কিছুদিন ধরে ভোরবেলায় হাঁটতে হাঁটতে আমি সেই রূপরেখার দ্বারা হৃতসর্বস্ব হয়ে উঠতাম। একদিন হৃত-সর্বস্ব হয়ে জল আর বৃক্ষের পাশ দিয়ে হাঁটছি। আমার সামনে শিশু-উদ্যানের খোলা দরজা। কোনো দিনও উদ্যানে ঢুকি না। কিন্তু সেদিন মুক্ত দরজার ওপরে বসে পড়েছিল টিয়াগুচ্ছ। সবুজের সেই উন্নয়ন দেখে আমি প্রবেশ করলাম। ভিতরে ভিতরে ষড়্‌রিপুর মতো ছোটো ছোটো ঘরে পাখি উড়ছে। ছোটো-ছোটো উঠোনে হাঁটছে হরিণ, কচ্ছপ সূক্ষ্ম-ভাবে মুখে নিয়েছে কপির ত্বক, ফুটে ওঠার সুযোগ খুঁজছে ময়ূর, কিন্তু ডালে ডালে এসে গেছে প্রস্ফুটন। ঘুরতে ঘুরতে মনে হচ্ছিল না এখানে মালীর অধিক কোনো মানুষ হাজির। তখন কোনো কুঞ্জ থেকে পরিষ্কার শব্দসমষ্টি রচিত হয়েছে—'কাঞ্চন, কাঞ্চন, এ তো কাঞ্চন ফুল।' কোন কুঞ্জ বাঙ্ময়, তা বের করতে এমন কি নিশ্বাসের সাহায্য নিয়েছিলাম। চোখের ভূমিকা খুব মৃদু হয়ে এসেছে। বেড়ে চলেছে বাতাসের অবদান। শুধু অভিমানের মতো একাগ্রতায় দেখে নিলাম নাকের কোন রন্ধ্র দিয়ে বাতাস বইছে। যেদিকে বাতাস বইছে শুধু সেই দিকে ঘুরে যাওয়া, আর কোনো ভার নেই। মনে পড়ে বামপন্থী হয়েছিলাম। তখন সন্নত হয়ে যে বৃক্ষ রাজাধিরাজ হয়েছে তার দরবার। চটি হাতে নিয়ে সেই দরবার পার হতে গিয়ে বুঝলাম ঝরাপাতা, মৃত্তিকা আর শিশিরের স্বাদ কত আত্মিক। পায়ের কাছে ঋণী রইলাম। যতদূর জানি ঋণী হবার পরেই

কুঞ্চমুখ ছিল। সেই মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল একটি উজ্জ্বল পরিবার। পরিবারের কিশোর-কিশোরী-বৃদ্ধা আর প্রৌঢ়কে ছাপিয়ে থই-থই যৌবন। আমার থেকেও লম্বা একজন তার শুক্ল ত্বকের প্রায় সর্বত্র প্রসারিত করেছে তন্তুর শতসহস্র স্নায়ু এবং কমলা থরে থরে ওপরে মধ্যে নীচে। সে হাসতে হাসতে দু হাত দিয়ে ধরে আছে ফুলের ডাল। সবাইকে থামিয়ে আবিষ্কারের পবিত্রতায় সে ডালটিকে এতটাই অন্তর্গত করে নিয়েছে যে মনে হচ্ছিল সম্ভব হলে সে তার রাত্রির স্তনভার মুক্ত আর মূর্ত করত। কিন্তু মুক্তি পেয়েছিল শব্দ এবং মূর্ত হয়েছিল শব্দ—'কাঞ্চন, কাঞ্চন, এ তো কাঞ্চন ফুল।'

পনেরো বছর পরেও কাঞ্চন ফুল কেন, কোনো ফুলই আমি চিনতে পারিনি। এই না-চেনাটা যে কত বড়ো অপরাধ তা অনেক পরে একটি কথায় মর্মে মর্মে বুঝেছিলাম। সেই অনেক পরের কথাটা স্মরণের শুরুতেই স্মরণ করে নেওয়া ভালো। বন্ধুর টাকায় আমার প্রথম কবিতার বই বেরিয়েছিল। যাদের যাদের ছুটে গিয়ে দিয়ে আসতে ইচ্ছে হল তাদের নামের তালিকায় এমন একজনের নাম ছিল যিনি এক প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক। প্রতিদিন সরকারি বাসে লম্বা পথ পার করে ক্লাসে নৃত্যের তালে তালে হাজির হতেন। হাজির হওয়া তো নয়, সে এক প্রাণময় উপস্থিতি। শোনা যায়, একমাত্র পুত্রের দেহান্তের পরের দিনও ক্লাসে তাঁর উপস্থিতি ছিল। কাঁধ পর্যন্ত নেমে গেছে অমলধবল কেশরাশি। তিনি সন্ধেরাতে দরজা খুলে আমাকে দেখে হেসে উঠলেন—'কী ব্যাপার, তুমি?'

খুবই সংকোচ ছিল, তবু না বলে পারলাম না—আমার একটা কবিতার বই বেরিয়েছে। এক কপি আপনাকে উপহার দিতে এলাম।

আমাকে উপহার দিয়ে কী হবে? আমি তোমাদের কবিতা বুঝি না। শুধু-শুধু একটা বই কেন নষ্ট করবে?

তবু আমি জোর করে তাঁর হাতে তুলে দিলাম একটি সবুজ শীর্ণ সংকলন। তিনি হাসতে হাসতে আমার পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত

এলেন। আমি দরজা পেরিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে যাব এমন সময় তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে একটু নীরবতা পালন করে উজ্জ্বল চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন—একটা ফুলের গন্ধ পাচ্ছ ?

একটা হালকা গন্ধ সত্যিই শোভা পাচ্ছিল। আমি সানন্দে স্বীকার করলাম—হ্যাঁ হ্যাঁ, পাচ্ছি তো ?

—বলো তো কোন ফুলের গন্ধ ? এই প্রশ্নের পর সেই প্রাণময় শিক্ষকের মুখে আমি যেন শিকারীর অপেক্ষা দেখলাম। একবার চারি-দিকে তাকিয়ে খুব অসহায় ভঙ্গিতে বলে ফেললাম—মনে হচ্ছে বেল-ফুলের গন্ধ। বিপুল হাসিতে চারিদিক কেঁপে উঠল—বেল নয়, শিউলি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এ-রকম ভুল করতেন না।

অধ্যাপকের শেষ বাক্যটিতে এমন এক নির্ভুলতা ছিল যা আমাকে অধোবদনে এবং নিঃশব্দে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। অথচ ফুল চেনার প্রহর জীবনের শুরুতেই পেয়ে গিয়েছিলাম।

অনেকেই জানে না জীবনের শুরুতে এই নগরের মধ্যে এমন এক পল্লী ছিল যা দ্বীপ মহিমার দিক থেকে, যাকে আজও বলা যায় পূর্ণ। অনেকেই জানল না পূর্ণসফর ট্রামগুলির সন্নিধানে গড়ে উঠেছিল পল্লীর দেহ আর চৈতন্য। এই পল্লীর নাভিমূলে আমার অবসরপ্রাপ্ত জ্যাঠামশাই তিনঘরের কমলা একতলায় দ্রবীভূত হতে চেয়েছিলেন। বলে রাখা ভালো, যে-দ্রবণ সম্ভব হয়েছিল তাকে আমি আজও বড়ো বলি। জ্যাঠা-মশাই জেনেছিলেন তিনঘরের পেছনে আছে পরিশীলিত পুকুর আর বহু গাছের নিমগ্নতা। তিনঘরের সামনে সুস্থ সড়ক এবং আধুনিক গৃহমালা। আর একদিকে শ্বেতপাথরের দোতলা যার মূল রমণী প্রত্যহ বেদানার রস অধিক পরিমাণে গ্রহণে সক্ষম। তাকে সহজে দেখা যেত না। কিন্তু তার আনন্দঘন কণ্ঠস্বর মাঝে-মাঝে পুকুর আর গাছ ছুঁয়ে ছুঁয়ে জ্যাঠামশাইয়ের ঘরের ভিতরে গিয়ে প্রমাণ করত সংগীত শতগন্ধ। অন্যদিকে আধা-সামরিক বাহিনীর পাঁচিল। জ্যাঠামশাই জানতেন অন্তত দুটি ঘরের জানলা খুললে দেখা যাবে প্রত্যুষ আর প্রাক্‌গোধূলির কুচকাওয়াজ। কিন্তু

আমি দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে জেনেছিলাম এই চতুর্দিক জুড়ে এমন এক ভুবন যা সর্বদা ব্যক্তিগত, এবং ব্যক্তিগত বলে দুরবগাহ।

এই পল্লীতে আমার বাস ছিল না। শুধু জ্যাঠামশাইয়ের স্নেহ-ভালোবাসার জন্য আমি সুযোগ পেতাম আট-দশ বছরের শরীরটিকে মাঝে মাঝে এই মাটিতে মেলে ধরার। প্রথম যেবার আসি, সে এক শীত-ঋতু ছিল। পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যের পরে। তিনঘরের প্রথম ঘরটিতে দাঁড় করিয়ে জ্যাঠামশাই আমার হাত ছেড়ে দিয়ে আমার টুপি খুলে দিলেন। সে এক স্বচ্ছ অবস্থা। বাড়ির পেছনে ছুটে যাবার ইচ্ছে হল। সেখানে তখন তরুলতার মাঝখানে পুকুর এবং পুকুরের ওপরে ওপরের আলো এসে পড়েছে। শ্বেতপাথরের দোতলা আলোয় সমাচ্ছন্ন। আমার খুবই কাছে কোথাও সদ্য উন্মোচিত হয়েছে ফুল। তার গন্ধের মধ্য দিয়ে জেগে উঠেছে ভবিষ্যতের শতগন্ধ। এক রোগা, নিম্নবিত্ত আর স্বপ্নময় কিশোরের পক্ষে এই অভ্যর্থনা ছিল যথেষ্ট। আমি স্থানত্যাগ করে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে ফিরে এলাম। এই প্রথম আমার একটি ফেরা অভয়ের দ্বারা আর্ত হল।

বাড়ির পেছনে দ্বিতীয়বার যখন গিয়ে দাঁড়ালাম তখন ভোর অদ্বিতীয় হবার সব কটি উপকরণ নিয়ে আমাকে গ্রহণ করল। চারিদিকে এত জঙ্গম জবা, পুকুরের কাছে যেতে গিয়ে পথ হারানোর সম্ভাবনা ছিল। দু হাত দিয়ে আনত জবা সরিয়ে সরিয়ে পথ করছি এবং প্রাতঃকালীন কুচকাওয়াজের বাজনা পাখিদের উড়িয়ে দিচ্ছে। এবার বুঝতে পারলাম পুকুরটিতে ভরে আছে শুধু জল নয়, জলের রাত-জাগা দায়িত্ববোধ। আর শ্বেতপাথরের ছাদের ঘর থেকে জলে নেমে আসার জন্য যে ঘোরানো সিঁড়ি সেই সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে ফুল। আমি চোখ বন্ধ করে হাত খুলে রেখেছিলাম। সেই কৈশোর যুগ থেকেই ফুল চেনার বদলে ধরতে চেয়েছিলাম ফুল। ফলে সবকিছুর মধ্য থেকে সবকিছু কিভাবে যে ঝরে গেল আজও সত্যিই বুঝতে পারলাম না। সেই ঝরার শব্দ এই নিথর রাত্তিরে আমার কানে লেগে আছে।

অপর্ণা এখন নেই, নেই জয়। রাত সত্যিই নিথর। এই নিথর রাতকে একটু আগে কাঁপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বিড়াল। কাঁদতে কাঁদতে সে তার সন্তানকে সর্বত্র খুঁজছে। ঠিক দুদিন আগে তরতাজা বিড়ালবাচ্চা দুপুরে জয়ের এঁটো খেয়েছে। কিন্তু বিকেল থেকে সেই সুন্দর সপ্রতিভ শিশু-টিকে আর কোথাও দেখা গেল না। রাতের খাওয়া শেষ হলে জয় অপর্ণার হাত থেকে এঁটোকাঁটার বাটি নিজে নিয়ে কতবার ডেকেছিল— আয় তিতিন, আয় তিতিন, আয় আয়। কিন্তু তিতিনকে কোথাও পাওয়া যায়নি। এমন-কি তার মরদেহ এই দুদিনেও খুঁজে পাওয়া গেল না। অপর্ণা খুঁজছে, জয় খুঁজছে, এমন কি আমিও অফিস থেকে ফেরার পথে এই দুদিন ট্রামলাইন আর বাসরাস্তায় দলিত সাদা দেহ খুঁজেছি। আমাদের দুদিনের খোঁজা শেষ হয়েছে। কিন্তু নবোদ্যমে শুরু হয়েছে মায়ের অন্বেষণ। আজ সারাদিন ধরে থেকে থেকে এক হেতুসর্বস্ব কান্না জ্বলে উঠছে। সেই সঙ্গে আছে এক অক্লান্ত গতি। কান্না একদিক থেকে আর একদিকে ; এক গলি থেকে অন্য গলিতে ছুটছে। একে থামানোর শক্তি আমার চারিদিকের কারও নেই। এইসব ভারী রাতের মধ্য থেকে কত রজনীবন্দনা উঠে এসেছে। যাঁরা সেইসব বন্দনাগান রচনা করেছেন তাঁদের কোনো একজনের সঙ্গেও আমার আজও দেখা হল না। এখনও বিজন রাতে বড়ো জোর নক্ষত্রবিস্তারের দর্শক হওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে না। আজ যদি অপর্ণা উপস্থিত থাকত কিছুতেই রাত জাগতে দিত না। মেয়েরা নিঃশব্দে কাউকে রাত জাগতে দেখলে বড়ো ভয় পায়। আর আমার ক্ষেত্রে আরও অসুবিধে আমি ধূমপান করি না। কোনো বইয়ের পাতার পর পাতা একনাগাড়ে পড়ে যেতে পারি না। কয়েক পাতা পড়ার পর বইটা উলটে রেখে একটু চুপ-চাপ বসে থাকা আমার স্বভাবের মধ্যে পড়ে। চুপচাপ বসে থাকা মানে মেরুদণ্ড সোজা করে কোনো ধ্যানস্থ ভাবও আমার থাকে না, কেবল চোখ খোলা রেখে দেহ সংকুচিত করে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকা। হাতে কোনো অগ্নি নেই, আঙুলের মধ্য থেকে উঠে আসছে না কোনো

ধূম্রবলয়, চোখে নেই কোনো উজ্জীবন, অথচ গভীর রাত, বিছানায় বিছানায় ফুটে উঠেছে নরমতম সব নিমজ্জমানতা। অপর্ণা কেন কোনো মেয়েই নির্ভয়ে প্রবল আলোকের নীচে বসে থাকা এমন কোনো পুরুষকে সহ্য করতে পারবে না। তাই মাঝে মাঝে ধূমপানের কথা ভেবেছি, অন্তত একটা কোনো নেশার কথা। নিশিতে নেশা ছাড়া বসে থাকা খুব একটা জমে উঠবে না। সিগারেট আমি খেতাম কৈশোরে, বয়ঃসন্ধির অনেক মুহূর্তে। যা হয়ে থাকে। শুরু হয়েছিল স্কুলের ছুটির শেষে। এক বিখ্যাত অভিনেতার পুত্র আমাকে স্কুলের পাশের একটা গলির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে হাতে তুলে দিয়েছিল জ্বলন্ত সিগারেট—'আমি বলছি কিচ্ছু হবে না, কেউ দেখছে না, তুই টান।' তার সরল কমনীয় চেহারার সঙ্গে এই দৃঢ় কণ্ঠস্বর যুক্ত হয়ে তাকে খুবই প্রভাবশালী করে তুলেছিল। আমি যে কী কষ্টে কতটা গ্লানি নিয়ে তার কথা মান্য করেছিলাম তা আমার আজও মনে আছে। মনে আছে বাড়ি ফেরার আগে সেদিন আমি অনেক কিছু মুখে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। কিন্তু দ্বিধা এবং অপবিত্রতাবোধ যা-কিছু সেই একদিনই। তারপর থেকে অতি সহজেই তামাকে অগ্নিসংযোগ বারবার ঘটেছে। ধূমপানের সমর্থনে নানা রঙের যুক্তিও সংগ্রহ করে ফেলেছিলাম : কোন মহাপুরুষ সিগারেট খেতে খেতে বলেছিলেন সিগারেট খাওয়া দাঁত আর মাড়ির পক্ষে উপকারী, পল্লীর কোন কোন সুন্দরী ধূমপানরত ছেলেদের অস্বস্তিদায়ক না ভেবে অপরিহার্য মনে করে, আমি সবই কণ্ঠস্থ করে রেখেছিলাম তখন। কিন্তু ধোঁয়া ভিতরে নিতাম না। মুখের মধ্যে কয়েক সেকেণ্ড রেখে সবই বের করে দিতাম। ফলে আমার সিগারেট খাওয়ার মধ্যে এমন একটা অসহায় কৌতুক ফুটে উঠত যা অনেকেরই উপভোগের বিষয় ছিল। কোনো এক অংশুমান বৃদ্ধের মুখে শহরের নানা গল্প শুনতে শুনতে এও শুনেছিলাম এমন সিগারেট আছে যা জ্বালালে বহুদূরে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। পাড়া আর বেপাড়ার বহু দোকানে সেই সুগন্ধ সিগারেটের খোঁজে আমার অনেক বিকেল কেটেছে। বহু স্মিত হাসির বহু বিকাশ দেখে দেখে এক-

দিন পরাজয় বরণ করলাম। সত্যিই তো সিগারেট আমার কাছে কোনো মাদকদ্রব্য নয়, তা আমার একটা মুদ্রাদোষ। আরও আবিষ্কার করলাম সুগন্ধ সিগারেটের সন্ধানে রত থাকার মানে আমি মুখে জ্বলন্ত ধূপ রাখার কথা ভাবছি। এই আবিষ্কারের পরক্ষণেই ত্যাগ করি সিগারেট এবং ধরি ধূপ। আজও শ্রেষ্ঠ ধূপের সন্ধানে পাড়া আর বেপাড়া ছাড়িয়ে যদি বেশ খানিকটা দূরে যেতে হয় তাতে কষ্ট থাকলেও ক্লান্তি থাকে না। এই তো সেদিন শুনলাম এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা খালের পারে কয়েকটি শিক্ষিত ছেলেমেয়ে মিলে চন্দনের ধূপ তৈরি করছে। আমি খবর পেয়ে দুপুরের শেষেই ছুটে গেছি। তাঁতের-শড়ি-পরা সুশ্রী মেয়ে খালের সমস্ত অপরিচ্ছন্নতা ভুলিয়ে দিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়েছে চন্দনের সংকলন। সেই সংকলন এখনও শেষ হয়নি। আমার ঘরে এখন যে দুটি কাঠি জ্বলছে তা সেই সংকলনের অংশ। সত্যিই স্বল্পমূল্যে এই রাতের ঘরে অমূল্য গন্ধের স্পর্শ এসেছে। ঘরেরও পরিবর্তন হয়। সে একটি সত্তা থেকে আর একটি সত্তায় মিশে গিয়ে একেবারে অন্যগন্ধ হয়ে যায়।

আজকাল এই ঘর আমার, অপর্ণার আর জয়েব। কয়েক বছর আগে ছিল আমার আর অপর্ণার। আমার আর অপর্ণার আগে এই ঘর যাঁর ছিল তিনি পিসিমা। ঠাকুরদার প্রথম পক্ষের কন্যা। নব্বইয়ের পরে পৃথিবী ছেড়েছেন। কিন্তু বিয়ে হয়েছিল ন মাস বয়সে। অপর্ণা বিশ্বাস করতে চায়নি। তার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন ন মাসের একটি শিশুকে থালার ওপর বসিয়ে ন বছরের একটি ছেলের সঙ্গে পরিণীত করার কাজ। এই বিবাহের কয়েক বছর বাদে ছেলেটির মৃত্যু ঘটে। তখন থেকেই পিসিমার নামের পাশে তিন অক্ষরের যে শব্দটিকে অক্ষয় করে রাখা হয় তা হল—বিধবা। পিসিমাকে আমি বহুবার হো-হো করে হেসে উঠে বলতে শুনেছি—আমি যদি বিধবা হই তবে চিরকুমারী কে? পিসিমার মৃত্যুর পর আমি বেশ কিছুদিন ধরে পৃথিবীর যে কোনো পাত্রে একটি উপবিষ্ট শিশুকন্যাকে কাঁদতে দেখেছি। আমাদের পরিবারে পিসিমার ভূমিকা কে পরিমাপ করতে যাবে? পিসিমার মা মারা গেলে ঠাকুরদা

তাঁর প্রথম স্ত্রীকে হারিয়ে একটু দিশেহারা হয়ে পড়েন। কারণ তাঁর সামনে সন্তান বলতে অষ্টাদশী এক বিধবা ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি যাবার আগে পুত্রের মুখ দেখতে চেয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। প্রবীণ পিতার মনোবাসনাকে রূপ দিতে কন্যা একনিষ্ঠভাবে পাত্রীর খোঁজ করতে শুরু করেন। আর পাত্রী নির্বাচন করে বাবাকে বিবাহে রাজি করাতে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। পাত্রী তাঁরই সমবয়স্ক। এই পাত্রী আমাদের ঠাকুমা, পিসিমার নতুন মা। নতুন মা থেকেই আমাদের বংশ শাখা বিস্তার করে চলেছে।

আমি সজ্ঞানে পিসিমাকে যখন থেকে দেখতে শুরু করি তখন তিনি সত্তর পার হয়ে গেছেন। কিন্তু রঙ তখনও সমুন্নত। চোখেমুখে অটুট ব্রহ্মচর্যের ছাপ। তখন চুল ছোটো করে পুরুষের ছাঁটে এনে ফেলেছেন। এমন এক লজ্জা বজায় রেখে হাসতে পারেন যাকে আধুনিক অর্থে ব্রীড়া বলে। তিনি আমাকে মাঝেমাঝেই গঙ্গাসাগরের গল্প শোনাতেন। তিনি তাঁর যৌবনে কয়েকজন বিধবার সঙ্গে বড়ো নৌকোয় বসে দিনের পর দিন কাটিয়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছেছিলেন। তাঁর কাহিনীর মধ্যে পথের যেসব দুর্গমতা ফুটে উঠত তা ঠিক রোমাঞ্চকর সব অভিযানের মতো আধুনিক। গঙ্গাসাগর কাহিনীটিকে তিনি যখনই শোনাতেন তার মধ্যে ঢেলে দিতেন একটি সিদ্ধির সমস্ত লাবণ্য। আজ আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে তাঁর যৌবনের সেই গঙ্গাসাগরযাত্রা তাঁর পতিগৃহযাত্রারই একটি রূপ হয়ে উঠেছিল।

পিসিমার রূপের খ্যাতি তাঁর রন্ধনের খ্যাতিকে ছাড়াতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। শোনা যায়, এই রূপবতী যুবতী একসময় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাঁর দলবল নিয়ে নানা শুভ অনুষ্ঠানের রান্না রাঁধতে চলে যেতেন। তাঁর গতি আর শক্তিকে শ্রদ্ধা জানাত গতিময় এবং শক্তিময় পুরুষেরা। কিন্তু আমার বয়ঃসন্ধির দিনগুলিতে পিসিমা সূর্যাস্তের পর তাঁর ঘরের চৌকিতে উঠে একেবারে স্থাণু হয়ে যেতেন। শত প্রয়োজনেও তাঁকে আর কেউ নেমে আসতে দেখতে পেত না। সেই সংকীর্ণ চৌকিতে

কখনও শুয়ে কখনও বসে তিনি শত শত তুচ্ছ কাহিনী সমান মমতায় আগ্রহী শ্রোতাকে শুনিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখতেন। আমি সেই ক্ষমতার সাক্ষী বহুবার হয়েছি। কখনও কখনও চৌকির একপাশে অতিকষ্টে বসে সত্যিই মন দিয়ে শুনতাম তাঁর নানারকম ফলবৃক্ষের অফুরন্ত দান, তাঁর দু-একটি গোরুর স্নেহময়ী প্রকৃতি, স্বাধীনতা সংগ্রামে একদল বিধবাকে পিছনে নিয়ে পতাকা হাতে তাঁর গ্রামের কয়েকটি পথ পরিক্রমণ। আঁতুড়ঘরের মঞ্চে ধাত্রীরূপে তাঁর বহু সাফল্যের খবর—ওরে আমি যে তোর মায়ের আঁতুড়ঘরেও ছিলাম।—তাঁর এই কথায় একটি অন্য ধরনের গরিমা হত আমার। আমি কোনো হাসপাতালে হইনি। আমার নানা সম্পর্কের অনেক ভাইবোন হাসপাতালের বাতাসে প্রথম নিঃশ্বাস নিয়েছে। আজও জানি না কেন ঠিক আমার সময়েই দেশের মাটির ঘর বেছে নেওয়া হল।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যেরাতগুলিতে পিসিমা অনেক সময় হাতপাখা তুলে নিয়ে বুকের কাপড় সরিয়ে হাওয়া খেতেন। অনেক সময় হাওয়া খেতে খেতে তিনি যেন একটু অস্থির হয়ে আমাকে বলে ফেলতেন—তুই এখন যা তো।—আজ আর বৃদ্ধার বুক বলে কিছু নেই। শুধু নেমে এসেছে মাংসের দুটি ঘন শৈথিল্য।—পিসিমা, তোমার বুকের কী অবস্থা হয়েছে। —এই বিস্ময় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমার দুটি হাত সেই শৈথিল্যপিণ্ডে গাঢ় হয়ে নেমে যেত। আবার পিসিমার অস্থিরতা—তুই এখন যা তো। —কিন্তু চলে যাবার বদলে আমি তাঁর বুক থেকে আর একটু নীচে নেমে যেতাম। পিসিমা আরো বেগে পাখা নাড়তে শুরু করতেন। আমি আরও নীচে নেমে গিয়ে বিস্ময়ের ভাব রাখতাম—কী অবস্থা হয়েছে! বিরাট দুটো হাড় ছাড়া কোমরে কিছু নেই।—এইবার পিসিমার মুখে নিজস্ব এক ব্রীড়ার উপস্থিতি টের পেতাম। টের পেতাম পিসিমা এবার সতর্ক আমি যাতে আরও নিম্নাভিমুখী না হতে পারি।—তুই এখন ওঠ তো, একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আয়।—এবার আমার না উঠে আর উপায় ছিল না। আমি চৌকি ছাড়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে জলের প্রয়োজন

অনুভব করতাম। জলই বহতা এবং জল পবিত্রতাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে আমার তখন যে স্নান ঘটত তারই মধ্যে আরোগ্যনিকেতন ছিল। এর বহু বছর বাদে, এই তো সেদিন, খুব উজ্জ্বল ছাপার পৃষ্ঠায় পড়লাম, জেস্যুট শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে মাতা মেরীর মর্মরমূর্তির সামনে ছাত্রদের গোপনতম নিঃসরণ ঘটছে।

পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগেও পিসিমা আমাদের এই ঘরে তাঁর নিজস্ব ব্রীড়া রেখে গেছেন। তিনি বরাবরই মৃত্যু সম্পর্কে নিঃশঙ্ক ছিলেন। বরং তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থার আলোচনায় তাঁর উৎসাহ খুব বেশি ছিল। তাঁর সৎকার যেন বৈদ্যুতিক চুল্লিতে না হয় এমন একটি নির্দেশ উচ্চারণ করতে তাঁকে বহুবার দেখা গেছে। মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগে এই ঘরে সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি। অন্তিম কষ্টের শেষ প্রহর চলেছে। হঠাৎ কী যে খেয়াল হল, বলে ফেললাম—কেমন আছ, পিসিমা? সেই মৃত্যুক্লিষ্ট মুখে ধীরে ধীরে বহুদূর থেকে আসা লজ্জাঘেরা যে হাসি ফুটে উঠল তা আমার অক্ষয় স্মৃতি হয়েছে।

শ্মশানেও ভেদ আছে, সেখানেও শ্রেণীযুদ্ধ চলে। শ্মশানে বিস্তীর্ণ সমভূমির এক কোণে উচ্চভূমি আছে। সমভূমিতে বেশ কয়েকটি গর্ত, বেশ কয়েকটি চিতাক্ষেত্র। আর উচ্চভূমি বা বেদিতে কেবলমাত্র দুটি চিতাক্ষেত্র। বেদিতে দাহ করতে গেলে কিছুটা প্রতিপত্তি চাই। বহু বছর ধরে শ্মশানের কাছাকাছি বাস করার সুবাদে আমরা পিসিমার জন্য বেদির চিতাক্ষেত্র নির্দিষ্ট করতে পেরেছিলাম। সকাল নটা থেকে দশটার মধ্যে পিসিমা চলে গিয়েছিলেন। তখন রোদ্দুর খুব তাড়াতাড়ি সহিংস হচ্ছে: পিচগলা রাস্তায় খালিপায়ে চলার সাহস আমাদের পরিচিত কারও ছিল না। আমরা বেলাশেষের অপেক্ষা করেছিলাম। এই অপেক্ষার মধ্যে কোনো বিচলন ছিল না। শুধু মেয়েরা পাউডারের গুঁড়ো আর সুগন্ধ ঢেলে ঢেলে দেহটিকে অচ্যুত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। ঠিক বেলাশেষে সামান্য হরিধ্বনি আর ছোটো একটি স্বজনগোষ্ঠীর দৌলতে পিসিমা পথে নামলেন। বিদ্যুৎ-চুল্লির পাশ দিয়ে যাবার সময় কেউ কেউ বলে উঠলেন—

ইলেকট্রিকে পোড়ানো অনেক ভালো। ঝামেলা কম, খরচ কম। এখানেই নামাও।—কিন্তু তখনও আমার কানে বাজছিল সেই ছোট্ট বাক্য—আমাকে কাঠে দিবি। দিবি তো? ফলে আমরা কোনোদিকে না তাকিয়ে কাঠের শ্মশানে পৌঁছলাম।

এই কাঠের শ্মশানে একবার এক বুড়ি জেগে উঠেছিল। তাকে তার লোকজনেরা জানি না কিভাবে নিয়ে এসে চিতায় তুলে দিয়ে আগুন দিতে যাবে, সে হঠাৎ চোখ মেলে বলে উঠল—জল, জল খাব। চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। বুড়িকে দেখার জন্য শহরের লোক ভেঙে পড়েছিল। শ্মশানে যাকে নিয়ে আসা হয়েছে সে আবার কী করে ঘরে ফিরে যাবে? তবে তো প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া হয়। তবে তো সৃষ্টি হয় বড়ো রকমের ভাবসংকট। এইসব যুক্তির সাহায্যে শ্মশানের পাশে এক বাঁধানো চাতালে বুড়ির জন্য ঘর বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। পিসিমা আমাকে নিয়ে এই বুড়িকে দর্শন করতে এসেছিলেন। আমার ভালো করে কিছুই মনে পড়ে না। শুধু এইটুকু মনে আছে, ভিড় ঠেলে বহুকষ্টে একটা গণ্ডির সামনে এসে দাঁড়িয়ে এক সাধারণ চেহারার বুড়িকে গণ্ডির মধ্যে খাটের ওপর বসে থাকতে দেখেছিলাম এবং তার মুখে লেগে ছিল সরু সুতোর মতো হাসি।

আমি জানতাম পিসিমার মৃত্যুর মধ্যে কোনো লুকোচুরি নেই। তিনি সবার মাঝখানে শুয়ে সবার মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেছেন। তবু ডোমেদের অপরিসীম সব অন্যায় আবদারের ভিতর দিয়ে গিয়ে যখন একসময় চিতা সজ্জিত করে পিসিমাকে ধীরে ধীরেতুলে দিয়ে অগ্নিসংযোগের উপক্রম করা হচ্ছে আমি লহমার জন্য আশা করেছিলাম পিসিমা বুড়ির অনুগামী হবেন। কিন্তু কোনো বাধা নেই। সব স্থির, সব নির্বাক। মুখাগ্নি করার জন্য আমার অনুজ উঠে দাঁড়িয়েছে। পিসিমা তাকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। আগুন কত সহজেই পিসিমার সর্বত্র নেচে নেচে ঢুকে যাচ্ছে। আমি তাঁর কোমর পর্যন্ত গিয়ে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ পিসিমা সতর্ক হয়েছিলেন। এখন তো

সতর্কতার কোনো প্রশ্ন নেই। এখন আছে আগুনের সর্বাত্মক আলিঙ্গন। এই প্রথম বিশ্বাস করতে চাইলাম পিসিমার বিবাহ হচ্ছে।' অগ্নির মতো শতমুখ স্বামী পেয়ে তাঁর আর কোনো অভিযোগ নেই। তিনি নিবেদিতা।

চিতা ভালোভাবে ধরে গেলে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়। আমাদের ছোটো দলটি নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কেউ কেউ এদিক-ওদিক ঘুরতে চলে গেল। কেউ কেউ ঘরে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হল—আসি নালীক, বাড়ি খালি ফেলে রেখে চলে এসেছি। কাল-পরশু একবার আসব। আমরা কজন চিতার দিকে তাকিয়ে বসে আছি। আমি, আমার ভাই, ভাইয়ের বন্ধু সুদিন। কেউ এসে একেবারে গা ঘেঁষে বসে পড়ল। কে ? তাকিয়ে দেখি দীপন। পদ্মাসনে বসে পড়েছে। চোখ বন্ধ। নাকে নস্যি লেগে আছে। দীপন আমাদের পাশের পাড়ার ছেলে। ওর বাবা তিনবার এম. এ. হয়েছেন। অধ্যাপক। অধ্যাপনার খ্যাতি আছে। কিন্তু দীপনকে তিনি স্কুলের সীমানা পার করাতে পারেননি। কিছুদিন হল দীপন বাড়িতে খুব কম থাকে। সে তার ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ায়। তাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে—কী করছ দীপন ?—সে সঙ্গে সঙ্গে একটিই উত্তর দিয়ে থাকে—আমি সুশিক্ষিত নই, আমি স্বশিক্ষিত।—তাকে পাগল বলার সাহস দেখেছি অনেকেরই আছে, কিন্তু আমার একটুও নেই। সেই ধুতিপরা, খোলাবুক, পৈতেধারী, খালি পায়ের যুবকটিকে আমি কোনো কোনো সন্ধ্যায় গানের মধ্যে দেখেছি। তার গলায় এমন একটা সংস্কারমুক্ত বিস্তার আছে যা বান্দিত গলাগুলিতে আমি পাইনি। দীপন পাশে এসে বসায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম। সে প্রথমে ধরল—ভেবে দ্যাখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম এই ভূমণ্ডলে। তাকে কোনো অনুরোধ করতে হল না। একটির পর একটি গান গেয়ে আমরা যারা নাভির অপেক্ষায় বসে আছি সে তাদের শান্ত করে দিয়ে উঠে গেল। আর তখনই লক্ষ করলাম অপর্ণা এসে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে তার বোন শোণিমা।

চিতায় জল ঢালার সময় হল। যারা এদিক-ওদিক ঘুরতে গিয়েছিল

তারা সবাই ফিরে এসেছে। কাদার মধ্যে নেমে কলসী ভরে জল এনে কয়েকবার চিতায় ঢালার কাজটা কিন্তু খুব একটা সহজ নয়, খুব একটা সুখেরও নয়। আমার ভাই কলসী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল গঙ্গার দিকে ; এটা বুবুনের প্রেরণার কাজ। কিন্তু সে সুদিনের কাছ থেকে বাধা পেল। তার হাত থেকে কলসী প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সুদিন ছুটল। সেদিন তারই আনা জলে চিতার সর্বশেষ অংশ বারে বারে ভিজে উঠেছে।

শ্মশান থেকে বেরিয়ে দেখি এই অঞ্চলে বিদ্যুৎ-সংকটের চিহ্ন প্রবল। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর ডাইনে-বাঁয়ে কারও না কারও বাড়ি এসে যায়। সবার আগে অপর্ণাদের বাড়ি। তারা দলচ্যুত হল। তারপর সুদিনের কাকার বাড়ি। ডানদিকের পুরনো দোতলায় সুদিন সংকোচে ঢুকে গেল। তারপর ডাইনে-বাঁয়ে আরও কয়েকজন। শেষ পর্যন্ত শ্মশান-প্রত্যাগত দলের সদস্য বলতে রইল দুজন—আমি আর বুবুন। আমাদের বাড়ির সদর দরজা মা ইচ্ছে করেই বন্ধ করে রেখেছে। গলি পার হয়ে পেছন দিক দিয়ে ঢুকতে হবে। অত্যন্ত অন্ধকার। মা লোহা আগুন নিয়ে কলতলায় দাঁড়িয়ে। বাবা বারান্দায়, হাতে মিষ্টি। আমরা শেষ পর্যন্ত দুজন ফিরেছি। আমাদের জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে দুজন—জামাকাপড় সব উঠোনে ছেড়ে রাখ।—একটিমাত্র উত্তোলিত হ্যারিকেনের আলোর পাশে মায়ের এই শান্ত নির্দেশ অন্ধকারকে কিভাবে যেন নতুন অবয়বে পৌঁছে দিয়েছিল। আমরা সেই অবয়ব ছুঁয়ে ছুঁয়ে স্নান করে নিলাম।

স্নানের পর পিসিমার ঘরে যাই। ঘরের মাঝখানে জলচৌকির ওপর প্রদীপ জ্বলছে। ঘর মুণ্ডিত হয়েছে। একটি বেশ বড়ো রকমের শূন্যতাকে বিরাজ করার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। আমি জানি এই কৃতিত্বের অংশমাত্র মায়ের, আর বাকিটাই বলতে গেলে শোভার। পাশের বস্তির উদ্বাস্তু মেয়েটি সারাদিন আমাদের বাড়িতে থেকে সন্ধ্যেবেলায় চলে যেত। দৈনন্দিন কাজকর্মে তাকে যে খুব একটা পটু বলা যেত তা নয়। বরং বাসনমাজার পর মা অনেক সময় বাসনের কোণে ভুক্তাবশেষ খুঁজে

পেতেন। ঘর কুড়িয়ে যাবার পর ঘরে আমিও অনেক দিন ময়লা অনুভব করেছি। একটু অন্যমনস্ক শোভা প্রাত্যহিক কাজে যতটা গাফিলতি দেখাত, গতানুগতিকে যতটা ম্লান ছিল, ঠিক ততটাই নিপুণ, ঠিক ততটাই উজ্জ্বল ছিল স্বতন্ত্র সব কর্মে। তাকে যদি বলা হত—শোভা, আজ তুমি দাদাবাবুর বইয়ের আলমারি গোছাতে পারবে? তোমাকে আজ অন্য কোনো কাজ করতে হবে না।—সে একগাল হেসে সম্মতি জানাত।

—নালীক, তুই শুধু একটু দেখিয়ে দে কী করে গোছাতে হবে। মায়ের ইঙ্গিতে আমি শোভাকে বইয়ের সেই স্তম্ভের সামনে ডাকি। ছটা তাকের মধ্যে আমি হয়তো ছ রকমের বই রাখতে চাই। আমি "মাদাম বোভারী"র পাশে "পথের পাঁচালী"কে রাখব। ব্লেকের কবিতার পাশে জয়েসের গল্প রাখব না। "সাবিত্রী"কে রাখব রামায়ণ-মহাভারতের পাশেই। "দিবারাত্রির কাব্য"কে ঠিক উপন্যাসের তাকে না রেখে হয়তো "ছিন্নপত্র" যেখানে আছে তার গা ঘেঁষে রাখতে চাইব। বইয়ের আলমারিতে যে বিন্যাস রয়েছে তাকে ভেঙে নতুন বিন্যাসের যে ভাবনা তা শোভার পাশে দাঁড়িয়ে আরও একবার ভেবে নিয়ে আমি ওকে সবকিছু দেখিয়ে দিলাম। আর শোভা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পরম মমতায় প্রতিটি বই ঝেড়েমুছে সংস্থাপিত করে গেল।

বাড়ি ফিরে দিনের শেষে দেখলাম যা চেয়েছি আলমারির স্তরে স্তরে সেটাই পাওয়া যাচ্ছে। এখন "মহাস্থবির জাতক" খুঁজতে আমি আর উপন্যাসের তাকে ঝুঁকে পড়ব না। "আত্মচরিত" কিংবা "আমার জীবন", না হলে বড়ো জোর "ওয়ার্ডস"-এর পাশেই তার দেখা পেয়ে যাব। যথাস্থানে বই না পেলে সত্যিই অসহায় লাগে। যথাস্থানে বই পেয়ে যাওয়ার ঘটনা কারো জীবনেই খুব একটা ঘটে না। এমনিতেই বই এমন একটা জিনিস যার অঙ্গে মহাকালের তাপ এবং ছাপ বেশ ভালোভাবেই ফুটে ওঠে। এমন অনেকদিন গেছে গ্রন্থনিবাসের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ অশ্রুসজল হয়েছে। এ কী, তাক থেকে প্রিয় বই তুলে নিয়ে দেখি তার শরীরের গোপন সব পর্বে পোকার কীর্তি। খুব যে অযত্ন করেছি তা তো

নয়। স্বাভাবিক যত্নের তেমন কোনো অভাব ছিল বলে মনে তো পড়ে না। কেউ বলেছে নিমের পাতা ছড়িয়ে দাও। দিয়েছি। কেউ বলেছে ন্যাপথালিনে কাজ হয়। প্যাকেট থেকে ধবলতম সব গুলি বের করে বইয়ের অনেক অলিগলিতে ছুঁড়ে দিয়েছি। তবু দেখেছি বিবর্ণতা এবং বিদীর্ণতা এক-একটি উজ্জ্বল মলাটের মধ্য দিয়ে বয়ে বয়ে একেবারে শেষ পর্যন্ত চলে গেছে। তখনই তো প্রশ্ন জাগে এত যে সব বই লেখা হচ্ছে, এত যে সব বই বেরোচ্ছে, এত যে সব বই পাওয়া যাচ্ছে, এত যে সব বই কেনা হচ্ছে প্রত্যেকেরই কপালে জরাজীর্ণ হবার প্রবল সব যোগ? তারই মাঝে যখন একটা দৃশ্যের প্রয়োজনে একটা বইয়ের খোঁজ পড়ে, একটা স্মৃতির সমর্থনে একটা কবিতাকে দেখে না নিলে চলে না, একটা অভিমানের প্রসারে একটা শব্দের সাহায্য পরমাত্মীয়ের মতো হতে চায়, তখন বই খুঁজতে গিয়ে যথাস্থানে না পাওয়া গেলে যে গ্লানি জন্মায় অন্তত কিছুদিনের জন্য শোভা তার কবল থেকে আমাকে মুক্ত রাখতে পেরেছিল। অন্যরকম কাজ বলতে যদি এক মাইল দূরের আত্মীয়ার বাড়ি থেকে বড়ো গঙ্গার স্বচ্ছ জল নিয়ে আসাকে বোঝানো হয় তবে সেই কাজেও শোভার মতো সমৃদ্ধ আর কে ছিল? শোভা যাবার সময় ট্রামে যেত। গঙ্গাজল দুটি বোতলে ভরে নিয়ে আসার সময় সে আর ট্রামে উঠত না। এই কাজটার মধ্যে সে একটা পবিত্রতার স্পর্শ পেত। দু হাতে দুটি বোতল নিয়ে তাকে হেঁটে হেঁটে আমাদের বাড়ির দিকে চলে যেতে আমিও দু-একবার ট্রামের জানলা দিয়ে দেখেছি। শোভা কেন চলে গেল তার অর্থ আমি আজও বুঝতে পারি না। তার দৈনন্দিন কর্ম পরিষ্কার না হলেও মা তার প্রতি সদয় ছিলেন। কখনও কখনও তার জন্য মায়ের যে অপেক্ষা তার মধ্য থেকে ফুটে বেরোত অপত্যস্নেহ। মাঝে মাঝে আমরা ঠিক বুঝতে পারতাম না কে কার সেবা করছে। কারণ শোভার সেবার পাশাপাশি মায়েরও এমন সব উদার, অদ্ভুত প্রশ্রয় ধরা পড়ত যাতে মনে হত মা শুধু কৃতজ্ঞ নন, মাও সেবার মধ্যে রয়েছেন। পিসিমার ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র সরিয়ে ঘর ভালো করে ধুয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে চলে

যাবার পর শোভা আর বেশিদিন আমাদের বাড়িতে ছিল না। মার সঙ্গে এ প্রসঙ্গে যা কথা হয়েছে তার থেকে কিছু বোঝা যায় না। মা বলেছিলেন—তোরা বিয়ে না করলে শোভা আর কাজ করবে না।

জয়কে নিয়ে সমস্ত বাড়ি অস্থির। অস্থিরতা সামলাতে গিয়ে অপর্ণা যা যা করে তা যে কোনো আধুনিক মহিলাই করে থাকে। তাকে নানাভাবে ভোলানো, তাকে বকাঝকা, তার ঘড়ি ধরে সেবা করা এবং তাকে নিয়ে বিকেলে বাইরে বেরোনো এবং এর সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে তাকে স্কুলে দিয়ে আসা এবং নিয়ে আসা। তবে একটা বাঁচোয়া—স্কুলটা প্রতিবেশী দূরত্বে। সত্যিই বাড়ি থেকে ঢিল ছুঁড়লে স্কুলের ছাদে গিয়ে পড়বে।

কেন আপনি আমাদের স্কুল সম্পর্কে উৎসাহী?—জয়ের ইনটারভিউয়ের সময় আমাকে এই কথাটির উত্তর দিতে হয়েছিল। আমিও স্কুলের সব গুণাবলীর মধ্যে না গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বলে ফেলেছিলাম—স্কুলটা যে বাড়ির খুবই কাছে।—চোখা চোখা জবাব দেবার ক্ষমতা আমার কিন্তু কোনো দিনও নেই। এবারে যে ছিল সেটা আমার নিজস্ব নয়। একটা বড়ো বসার ঘরে রবিবারের সকালে বসে এক প্রভাবশালী সুন্দরী আমাকে বারবার শিখিয়ে দিয়েছিলেন।—যা যা বললাম সেগুলো ছেলেকে একটু শেখাবেন। আর ভুলে যাবেন না যেন, আপনাকে জিজ্ঞেস করুক বা না করুক, স্কুল যে আপনার পাড়ায় সে কথাটা কিন্তু ওদের শুনিয়ে দেবেন।—আমার ভাগ্য ভালো, কথাটা জিজ্ঞাসার উত্তরে শোনাতে পেরেছিলাম। না হলে নির্ঘাত একটা গুরুত্বকে মূল্য দিতে গিয়ে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি হত। এমনিতে তো জয় দু-একটা গুরুচণ্ডালীর সৃষ্টি করে ফেলেছিল। একটি ফুল দেখিয়ে জয়ের কাছে ইংরেজিতে জানতে চাওয়া হয়েছিল সেটা কী বস্তু। জয় সেদিনও অপর্ণার খোঁপায় ফুলটিকে দেখেছে, তার পরিচয় জেনেছে। তার মায়ের খোঁপায় দেখা ওই ফুলের অবস্থানটির কথাই তার নিশ্চয়ই মনে পড়েছিল; নিশ্চয়ই মনে পড়েনি ছবির বইতে দেখা ওই ফুলের অবস্থান। তা না হলে সে কেন টেবিলের ওপারে তার মায়ের সমবয়সী দুজন শাণিত

যুবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিল—'গোলাপ' ? জিজ্ঞাসিত না হয়ে আমি যদি গোলাপের পরেই তাদের জানিয়ে দিতাম—আমরা কিন্তু আপনাদের খুব কাছে থাকি—তবে সেটা কতদূর সভ্য হত জানি না। আজ শোভা থাকলে সুসজ্জিত জয়ের হাত ধরে স্কুলের দরজায় যাওয়া এবং বাড়ি ফিরে আসার কাজটাকে বইয়ের আলমারি সাজানো অথবা বোতল ভরে গঙ্গাজল নিয়ে আসার সমধর্মী একটি কাজ বলেই যে সে গ্রহণ করত এ-ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। শোভা জয়ের জন্য কিছু সময় দিলে অপর্ণার তহবিলে যে সময় জমা পড়ত তার দ্বারা সে অন্তত তার দেয়ালে টাঙানো তানপুরার ধুলো ঝেড়ে আবার টাঙিয়ে রাখতে পারত। তার বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে আসতে পারত বহু দিন আগে নিয়ে যাওয়া তারই তবলার খোঁজ। কিংবা আমাকে অফিসে যাবার মুখে শুনিয়ে দিতে পারত জয়ের নতুন দেখা দু-একটা স্বপ্নদৃশ্য, দু-একটা শব্দবন্ধন। অপর্ণা আমাকে বলেনি, আমি সেদিন নিজেই শুনলাম দু-একটি কথা। অপর্ণা জয়কে স্নান করাচ্ছে। কখনও কখনও শরীর বুঝে দিনের আবহাওয়া বুঝে জয়ের ঠাণ্ডা জলের সবুজ গামলার পাশে গরম জলের লাল গামলা রাখা হয়। সেদিনও তেমন কিছু ছিল। হয়তো অপর্ণা সবুজের মধ্যে ঢেলে দিতে চাইছিল লালের খানিকটা। তাদের কোনো সংলাপেই আমার কান ঠিক ছিল না। কিন্তু দু-একটা শব্দবন্ধন বেশ জোরে উচ্চারিত হচ্ছিল। আমি হঠাৎ শুনলাম জয়কে সমর্থন করে অপর্ণা বলছে—ঠিক বলেছ। ওটা ভালো গরম, আর এটা বিষাক্ত ঠাণ্ডা।—সত্যি বলছি বহু ঠাণ্ডার বর্ণনা পড়েছি, নিজেও ভেবেছি বহু ঠাণ্ডার কথা, কিন্তু 'বিষাক্ত ঠাণ্ডা' আমার কাছে নতুন। একদিন জয় নিজেই ঘুম থেকে উঠে বিছানা থেকে না উঠে আমাকে বলল, বাবা, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।

—কী স্বপ্ন দেখেছ ? আমাকে বলবে না ?

—আমি স্বপ্ন দেখলাম তুমি মরে গেছ। আমি কাঁদছি, মা কাঁদছে, কাকা কাঁদছে, দাদু কাঁদছে, দিদি কাঁদছে। তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

—খুব ভালো স্বপ্ন দেখেছো, খুব ভালো স্বপ্ন।

অপর্ণা ছুটে এসেছিল।—কার স্বপ্নের কথা বলছ? কে স্বপ্ন দেখেছে?

—তোমার ছেলে স্বপ্ন দেখেছে আমি মরে গেছি। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তুমি কাঁদছ, ও কাঁদছে, কাকা কাঁদছে, সবাই কাঁদছে।

—বিচ্ছিরি বাজে স্বপ্ন। মা শোনো, তোমার নাতি স্বপ্ন দেখেছে।

মা উনুনের পাশ থেকে ছুটে এলেন।—কী স্বপ্ন? সোনা, কী স্বপ্ন দেখেছে?

মা স্বপ্নদৃশ্য শুনে নিজেকেই সব থেকে বেশি আশ্বস্ত করলেন।—খারাপ কোথায়! ভালো স্বপ্ন। নিজেরটা দেখলে পরের হয়।

বাবা পাশের ঘরে খবরের কাগজে আবদ্ধ। বুবুন বাড়ি আছে কিনা জানি না। জানি এই স্বপ্নদৃশ্য এবার বাবার চোখের সামনে ধরা হবে, বুবুনের চোখের সামনে ধরা হবে। জয়ের দেখা স্বপ্নদৃশ্যে প্লাবিত হয়ে যাবে এই বাড়ি। শোভা থাকলে স্বপ্নদৃশ্যে একটি নাম নির্ঘাত যোজিত হত। কারণ জয় কাউকে বাদ দিতে চায় না। সে সবাইকে রাখতে চায় বলে সে বলতই—আমি কাঁদছি, মা কাঁদছে, কাকা কাঁদছে, দাদু কাঁদছে, দিদি কাঁদছে, আর শোভাপিসি কাঁদছে।

শোভা চলে যাবার কয়েক মাস বাদে আমি বুঝতে পারি একটা নীরব প্রস্তুতি চলছে। মামাদের রবিবারের বিকেলে মার ঘরে উপস্থিত হতে দেখা যাচ্ছে। দু-একজন মোটা মোটা সাদা সাদা বিধবা বাবা-মার সঙ্গে নীচু স্বরে কথা বলে উঠে যাচ্ছে। আমার কোনো কোনো বন্ধুকে মা অসময়ে ডেকে পাঠাচ্ছেন। তাদের হাত থেকে আমি মাঝে মাঝে ছবি পাচ্ছি। কেউ গাছে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। কেউ মুখে হাত রেখে অন্যমনস্ক। কেউ সকলের মাঝখানে বসে একা হবার চেষ্টা করেছে। আমি বন্ধুদের হাতে ছবি ফিরিয়ে দিয়ে চুপ থাকছি। একদিন মা সরাসরি আমার কাছে চলে এলেন—তোর কাউকে পছন্দ হল না?

এই প্রশ্নের একটিমাত্র জবাব আমার জানা ছিল।—তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? সময়মতো আমি তোমাকে ঠিক জানাব।

মা কী বুঝলেন জানি না। কারণ আমার কথার মধ্যে কোনো সংকেত ছিল না। আমি শুধু অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম। এর পর থেকে মামা-দের আনাগোনা খুব কমে গেল। সক্রিয় বিধবাদের আমি আর দেখতেই পেলাম না। এক অভিমানশাসিত মৌনের মধ্যে মা যেন চলে যেতে চাইলেন।

সেই পর্বে আমি পেয়ে গেলাম অপর্ণার বাবার শ্রাদ্ধবাসর। সাদা শামিয়ানা বাতাসে কাঁপছিল একটু ভারী রাতে। অপর্ণার বাবা শেষ কদিন খুব যন্ত্রণা পেয়ে চলে গেছেন। তার আগে দশ বছর ধরে তিনি একটার পর একটা বিষয় নিয়ে ভেবেছেন, উদ্যোগী হয়েছেন, পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু মাঝপথে আবার সবকিছু থেকে সরে এসে নিজের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছেন। সেই দশ বছরের অনেক মুহূর্তে তাঁকে আমি দেখেছি। তিনি কথা বলতেন কম। কিন্তু যখন কথা বলতেন কথার মধ্যে থাকত অনুভবের দোলা। আমাকে তিনি দু-তিন দিন ধরে একবার বিশ্বাসের জগৎ নিয়ে যে নৈঃশব্দ্য দাঁড়িয়ে আছে তার কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। যৌবনে তিনি এক ওষুধের কারখানার অভিভাবকের প্রিয়-পাত্র ছিলেন। তখন তাঁকে কর্মসূত্রে এমন একটা শহরে যেতে হত যেখানে নদী আর পাহাড়ের সহাবস্থানে গভীর নিসর্গ হয়েছিল। তিনি কাজের শেষে নদীর পাড়ে বসে থাকতেন। কখনও কখনও আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে শুনতে পেতেন বিশ্বাসের ডাক—তুমি আমার মধ্যে এসো। তুমি আমার মধ্যে এসো।—পাহাড়ের ওপরে একটা মন্দির ছিল। বছরের এক-একটা দিনে বহু দূরের মানুষ সেই কঠিন পাহাড়ের গা বেয়ে অসম্ভব উৎসাহে চূড়ার মন্দিরে উঠে যেত। অপর্ণার বাবা যাতায়াতের পথে অসংখ্য মানুষের সেই একাগ্র আরোহণ দেখেছেন। তাঁর নিজের পক্ষে সেই উৎসাহ কোনোদিনও ছিল না যার দ্বারা চালিত হয়ে পাহাড়ের পথ চুম্বন করা যায়। একবার তাঁর একটি পা আস্তে-আস্তে খরচের খাতায়

চলে যেতে লাগল। তাঁর কর্মস্থানের অভিভাবক তাঁর পায়ের জন্য শ্রেষ্ঠ চিকিৎসার সুযোগ করে দিলেন। তিনি ভিতরে এবং বাইরে গ্রহণ করতে লাগলেন সুসভ্য বৈদ্যদের সুচিন্তিত সব ওষুধ। কিন্তু বুঝতে পারলেন সবই শেষ পর্যন্ত ফুরিয়ে যাচ্ছে, কেউ কোনো সাহায্যে লাগছে না। সেই অসুস্থ পা নিয়ে তিনি জোর করে তাঁর শহর থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের একটা দায়িত্ব বহন করে কিছুদিনের জন্য নদী আর পাহাড়ের সেই শহরে আবার এসে পৌঁছলেন। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানা বর্ণের ওষুধ খেতেন এবং রাতে বাড়ি ফিরে অসুস্থ পাটিকে সঁপে দিতেন ভৃত্যের কোলে। সেদিন রবিবার। তেমন কোনো কাজ নিয়ে ভুলে থাকার যো নেই। তবু রসায়নের বই পড়ে সারাদিন কাটালেন। সন্ধ্যের দিকে মন আর কিছুতেই ঘরে থাকতে চায় না। বহুদিন বাদে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নদীর পাড়ে এসে বসলেন। হাওয়া দিচ্ছিল। নক্ষত্র ঊর্ধ্বকে করে রেখেছিল সুস্নাত। বহুক্ষণ পরে বাড়ি ফেরার জন্য উঠেছেন। নিজেও জানেন না চলতে-চলতে কখন সেই পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেতে শুরু করেছেন। কানের পাশ দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ শুনতে পেলেন বাতাস বেজে উঠে বলছে—তুমি আমার মধ্যে এসো। তুমি আমার মধ্যে এসো। ডানদিকে তাকিয়ে দেখলেন পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে সাদা মন্দির পর্যন্ত একটি বিরাট হাতছানি—এসো, এসো, এসো, এসো হে।—সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হল না। পরের দিন ভোরে উঠে স্নান করে তিনি ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন পাহাড়ের পাদ-দেশে। দেখলেন মানুষের পর মানুষ প্রেম আর প্রযত্নে ওপরের দিকে ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে। আর সেই সমবেত আরোহণের আলোয় পাথরে নেমে এসেছে বরাভয়। তিনিও হামাগুড়ি দিয়ে সেই ওপরের পথকে আলিঙ্গন করতে শুরু করলেন। কতক্ষণ পরে সাদা মন্দিরের কোলে এসে উঠলেন তা তিনি জানতে পারেননি। কিন্তু জেনেছিলেন মর্মে মর্মে, তাঁর যে পাকে তিনি এতদিন অশক্ত বলে মেনে এসেছিলেন তা হয়ে উঠেছে সহায়ক এবং শক্তিমান।

তিনি ঠিক কোন সময়ে মারা গিয়েছিলেন কেউ জানতে পারেনি। চলে যাবার আগে জানলার পাশের খাটটিতে শুয়ে তিনি কোনো শব্দ না করে দগ্ধ হচ্ছিলেন। এইভাবে কেটেছিল অন্তত এক মাস। সেই সব সময়ে তিনি যে বেঁচে আছেন তা একমাত্র প্রমাণ করতে পারত তাঁর চোখ। অফিস থেকে ফিরে রাতের দিকে তাঁর খাটের সামনে একবার গিয়ে রোজ দাঁড়িয়ে পড়াটা আমার অভ্যাসেরও অন্তর্গত হয়ে পড়েছিল। তখনই দুটো চোখ পূর্ণাশ্রু নিয়ে ফুটে থাকত। আমি মাসিমা, অপর্ণা, শোণিমা কিংবা সুজনদা যাকে যখন পেতাম ইঙ্গিতে ওই চোখ দেখিয়ে দিতাম। তাঁর খাটের নীচে প্রতিদিন বিছানা পড়ত। অধিকাংশ দিন-গুলিতে সুজনদা বাবার নীচে শুয়ে রাত কাটাত। এই পর্বতাভিযাত্রী যুবকের কাছে মৃত্যুপথযাত্রী পিতাকে লক্ষ্য করে রাত কাটানো তেমন কোনো শ্রমের কাজ ছিল না। মাঝে মাঝে সুজনদাকে দু-একদিনের জন্য হলেও তখনও ছুটে যেতে হত বাইরে তার সঙ্ঘের কাজে। সেই অনু-পস্থিতির সময়ে শোণিমা তার দিদিকে নিয়ে বাবার নীচে শুয়ে পড়ত। দুজন বাবার সাশ্রু নীরবতার মাঝখানে নানা কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ত। সেদিনও ছিল তেমন এক রাত। সুজনদা বাইরে। মাসিমা পাশের ঘরে। শোণিমাকে নিয়ে অপর্ণা বাবার ঘরের মেঝেতে অনেকক্ষণ গল্প করে ঘুমিয়েছে। অপর্ণার ঘুম ভাঙে ভোরে। উঠে দেখে বাবার শিয়রে সরলতম আলো এসে পড়েছে। কিন্তু বাবার চোখে ঝরে যাবার চিহ্ন। সে শোণিমাকে ডেকে যৌথভাবে বাবাকে নানাভাবে ডাকতে শুরু করে এবং মাসিমা সেই ঘরে এসে দাঁড়ালে জ্ঞানত বুঝতে পারে বাবা আর নেই। শ্রাদ্ধের আগে মৃত্যুর সময় নিয়ে বেশ সংকটের সৃষ্টি হয়। রাত বারোটার পর থেকে ভোরের পূর্ব পর্যন্ত যে সময় তার কোন বিভাগকে ধরা হবে ? শেষে সমবেত সিদ্ধান্ত হয় অবসান যখন ভোরেই প্রথম ধরা পড়ল তখন ভোরই হবে অবসানের ব্যবহারিক কাল।

সেই ভোরে আমাকে ঘুম থেকে তুলেছিলেন মা।—নালীক ওঠ, অপর্ণা এসেছে। বিধুবাবু চলে গেলেন।—উঠে দেখলাম আমার পায়ের

দিকে দাঁড়িয়ে আছে যে মেয়েটি তাকে আমি এক যুগ ধরে দেখে আসছি। প্রথম যখন সুজনদার সঙ্গে তাদের বাড়ি যাই সে তখনও ফ্রকের মধ্যে আছে। কালো কালো কিন্তু লাবণ্যময় হাত-পা। সহাস্য এবং সপ্রতিভ। সফেন কফির কাপ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।—তুমি নিশ্চয়ই অপর্ণা ?

—হ্যাঁ। আপনি কি করে বুঝলেন ?

—সুজনদা বলেছিল, দেখবি যে ফেনায় ভরা কফির কাপ নিয়ে এসে দাঁড়াবে সে অপর্ণা। আর যে তোর সামনে একেবারেই আসতে চাইবে না শোণিমা তার নাম। তুমি তো গানের চর্চা কর। গান শোনাবে ?

—আজ এখনই শুনবেন ?

—আজ এখনই শুনতে ইচ্ছে করছে।

—ঠিক আছে, আপনি কফি খেয়ে নিন। আমি একটু পরে আসছি। একটু পরে সুজনদা এল, অপর্ণা এল, মাসিমা এলেন। অপর্ণা শতরঞ্জি পাতল। হারমোনিয়াম এবং তবলা নামাল। তখন অপর্ণা হারমোনিয়াম বাজাতে সাহস পেত না। মাসিমা হারমোনিয়াম টেনে নিলেন। তবলা ঠিক করতে করতে সুজনদা বলল—অপু, ঠিক করে গাইবি। নালীক কিন্তু মুখের ওপর সমালোচনা করে।—ঠিক প্রার্থনার ভঙ্গিতে অপর্ণা বসেছে। মাসিমার আঙুল হাঁটছে। সুজনদা প্রস্তুত। এই সময় সুজনদার ডাকে শোণিমা ধীরে ধীরে এসে শতরঞ্জির এক কোণে বসেছিল। এক যুগ আগের সেই সরলতা অপর্ণার মধ্যে ফুটে উঠেছে।—কী হবে নালীকদা ? দাদার আজ বিকেলে ফেরার কথা।

তেমন কিছুই হবার ছিল না। সঙ্ঘের কাজ থেকে ঠিক বিকেলেই সুজনদা ফিরে আসে। শুধু সমস্ত নিয়ম পালনের পর আমরা সবাই যখন সরে এসে আগুনের দায়িত্ববোধ লক্ষ্য করতে যাচ্ছি, অপর্ণা সেই সান্ধ্য শ্মশানে সকলের মাঝখানে আমার হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকেছিল।—নালীকদা, তুমি যে বলেছিলে বাবার এখন কোনো মৃত্যু নেই।—আমি কখন কাকে কী বলেছিলাম জানি না। আমার তালু সজল হচ্ছিল। সেই

প্রথম এবং সেই শেষবার আমার জানা হয়েছিল চোখের রস কতখানি সক্ষম হতে পারে।

শ্রাদ্ধবাসরে সাদা কাপড় উড়ছে। ঝড় উঠবে না কি ? খাওয়াদাওয়া শেষ। এই তো শেষ দল মুখ মুছতে মুছতে চলে গেল ; এই তো শেষ হল একেবারে ঘরের লোকদের কারও কারও মিষ্টি বেছে খাওয়া, কারও কারও শরবতে চুমুক। অনেক আগে আমি খাওয়ার ঝামেলা মিটিয়েছি। পাতের কাছে সুজনদা নিজে এসে দাঁড়িয়েছিল।—নালীক, তুইও কি লজ্জা করবি ?

—তুমিও কি আজ ভুলে গেলে আমি সত্যি কতটুকু খাই ?

—তাই বলে এত কম খাবি ? মনে নেই বাবা তোকে বসিয়ে লুচি ছোলার ডাল খাওয়াতেন।

সুজনদার গলায় অন্তত আজকের জন্য এসে পৌঁছেছে সমতলের সুর।

অপর্ণা শরবত খেয়ে ছাদে উঠে গিয়েছে। এতক্ষণ তাদের দোতলার ঘরে বসে আমি এত ভিড়ের মধ্যেও বই পড়ার চেষ্টা করছিলাম। প্রথমে অবশ্য টেনে নিয়েছিলাম খবরের কাগজ। কিছুক্ষণ খবরের কাগজ পড়লে অনেক কিছু নিশ্চয়ই জানা যায়, হওয়া যায় তথ্যশিকারি। চায়ের টেবিলে অথবা রাস্তাঘাটে অথবা উৎসবের সন্ধ্যেগুলিতে নানা তথ্য কথা চালিয়ে নিয়ে যেতে খুব সাহায্য করে। কিন্তু এই তথ্যের সমাবেশের দ্বারা এমন এক গতির উৎপত্তি হয় যা কিছুক্ষণ বাদে আমাকে খুব ক্লান্ত করে দিয়ে যায়। আমি ট্রেন-দুর্ঘটনার পাশেই পেয়ে যাই মেয়েদের অস্বস্তির দিনগুলিতে কী করে স্বস্তি পাওয়া যায় তার বড়ো উপায়। বুনো হাতির আক্রমণের পাশেই জাতীয় অতিথির নৈশ খাদ্যতালিকা আমার জানা হয়ে যায়। উপনিষদের উচ্চারণের নীচে ঝলমল করে নারীর সুমার্জিত দাঁতের হাসিরাশি। আমি খুব দিশেহারা হয়ে পড়ি। এত মঞ্চ, এত আলোক-সম্পাত, এত দলবদ্ধতা আমার ঠিক সহ্য হয় না। তাই আজকাল শিরো-নামগুলি নিজেকে দেখিয়ে নিয়ে অল্পে সন্তুষ্ট হবার চেষ্টা করি। শিরোনাম দেখতে গিয়ে কোনো কোনো উদ্দীপক সংবাদ মাঝে মাঝে নজর এড়িয়ে যায়। আজও যাচ্ছিল, কাগজ সরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। আমি যে ঘরে

বসে ছিলাম সেই ঘর হঠাৎ শূন্য থেকে পূর্ণ হয়ে গেল কয়েকজন বৃদ্ধের দল-বদ্ধ প্রবেশে। কোনো সংলাপে যোগ দেব না, চুপ করে বসে থাকব, এই ছিল লক্ষ্য। কাগজ আবার মুখের সামনে মেলে ধরে উপলক্ষের সৃষ্টি করলাম। তখনই চোখে পড়ল, একজন শিল্পী সরকারের দেওয়া পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে যে-কাজের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়েছে তার কোনোই গুরুত্ব নেই। এই বড়ো খবরটাকে ছোটো করে এক কোণে ছাপানো হয়েছে। বৃদ্ধদের দল থেকে আমাকে যে লক্ষ্য করা হচ্ছে তার কোনো প্রমাণ পেলাম না। এই দলটি কীর্তনের আলোচনায় এনে ফেল-ছিল নানা কণ্ঠের নানা রকম স্মৃতিসূত্র। আমি কাগজ রেখে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলাম পাড়ার দুর্গামণ্ডপের পত্রিকা। এবারে যাদের হারিয়েছি এই পর্যায়ে কয়েকজনের ছোটো ছোটো ছবি দিয়ে দুটি পাতা পূর্ণ করা হয়েছে। আমি দুজন ছাড়া আর কাউকে চিনতে পারলাম না। মৃতদের এই ছবির সংকলনে নানা বয়সের মানুষ। এমন কি এক শিশুকেও রাখা হয়েছে। পাড়ার এত লোক কোনো শব্দ না করে চলে গেছে? যে শিশুটি চলে গেছে, যে তিনজন যুবতী হাসছে, যে যুবক আর প্রবীণেরা একে অপরের পাশে ফুটে আছে তাদের জন্য আমার দুঃখ হল। কিন্তু যে দুজনকে আমি চিনি, যে দুজনের কাছে আমাদের ঋণ রয়ে গেছে, যে দুজন একদিন সত্যিকারের শ্মশানবন্ধু হয়েছিল তাদের ছবি দেখে আমার বিশ্বাস ব্যাহত। সুদিন আর দীপন এত তাড়াতাড়ি চলে গেল? এই তো সেদিন একজন গান গেয়ে আর একজন চিতায় কলসীর পর কলসী উপুড় করে শ্মশান ভরিয়েছিল।

বৃদ্ধরা সদলে এক সময় নেমে গেছেন। শোণিমা আমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে ছাদে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। ছাদ প্রবল বিদ্যুতে বাঁধা পড়েছে। ছাদের তিনটি বিভাগ হয়েছে। সবচেয়ে ছোটো ভাগ পড়েছে রান্নার এলাকায়। এবার একদিকে খাওয়াদাওয়া অন্যদিকে সকালে শ্রাদ্ধ, সন্ধ্যেবেলায় কীর্তন আর মানুষের ওঠা-বসা। ঠাকুররা নামছে। তারা বসে না খেয়ে তাদের খাবার সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। খাওয়াদাওয়ার অংশে

কাঠের পর কাঠ পড়ে রয়েছে। আকৃতি-প্রাপ্ত সব দারু, তা ছাড়া কিছু নেই। শুধু শ্রাদ্ধের অঞ্চলটিতে পা ছড়িয়ে বসে টুকরো টুকরো কথা যারা বলে যাচ্ছে তারাই তো মাসিমা, অর্পণা, সুজনদা, শোণিমা। মাসিমা হেসে আমাকে দেখলেন—নালীক, তোমার মা তোমার খোঁজ করছিলেন। তুমি কখন বাড়ি ফিরবে জিজ্ঞেস করছিলেন। উনি একটু ব্যস্ত হয়েছিলেন। তোমাদের ওদিকটাতে নাকি সন্ধ্যের পর গণ্ডগোল হয়েছে। আমি বোধ হয় বোমের শব্দ পেয়েছিলাম।

—মা কখন খোঁজ করছিলেন?

—তা প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে। আমি বললাম, নালীক যা লাজুক, দেখুন কোনো ফাঁকা জায়গা খুঁজে নিয়ে বই নিয়ে বসে আছে। শোণি একটু আগে বলল, নালীকদা, মা, কোণের ঘরটাতে একদম চুপ করে বসে আছে। আমি বললাম ওকে এখানে ডেকে নিয়ে আয় না।

অকালে মাসিমার সব চুল সাদা হয়ে গেছে। এর ওপর বসনও বিবর্ণের দিকে ন্যস্ত। সাদা বিদ্যুৎ, সাদা শামিয়ানা। কিন্তু সেই পরিণত রাতে সেই শ্বেত পটভূমিতে তাঁকে মনে হয়েছিল সার্থক সুন্দরী এবং নিরঞ্জনা। গতকালই তো, শ্রাদ্ধের আগের দিন, ঘরদোর পরিষ্কার করতে নেমেছিল দুই বোন। শোণিমা বনেদি কাঠের প্রাচীন ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে নেমে এসে দেরাজ টেনেছিল। এইসব দেরাজের অন্তত দুটিতে মেসোমশাই তাঁর কাগজপত্র রাখতেন। বহু কাগজপত্র বেরিয়ে আসছিল শোণিমার তৎপরতায়। আমি সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম। যে ঘরে প্রাচীন এবং বিশাল ড্রেসিং টেবিল সেই ঘরের একটা জানলার খুব কাছে কদম তার ফুল আর ডালপালা নিয়ে বিরাজ করত—আমিও সেই স্থিতি দেখেছি। মাত্র এক রাতের ঝড়ে কী ভাবে লুটিয়ে পড়েছিল কদমের সারাংশ তাও দেখার সুযোগ হয়েছে। আর তখন দেখছিলাম বয়সে কম নয়, ঝড়ে অটুট, প্রথম শ্রেণীর সজীবতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কদমের সেই প্রতিবেশী অশথকে। আমি একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছিলাম অশথের ঝলমলে পাতার শেষদিকটা কতখানি একাগ্র। তখনই শোণিমা চেঁচিয়ে উঠেছিল—নালীকদা, দ্যাখো বাবার

কবিতার খাতা পেয়েছি।—যিনি কবিতা না ছাপিয়ে কবিতা লিখে গেছেন তাঁর কবিতা তাঁর নিজেরই জন্য। নিশ্চয়ই সেই পরম ব্যক্তিগত খাতাটি বসে বসে দেখার লোভ আমার থাকবে। সেই খাতা বাড়িতে নিয়ে আসার অধিকার পেয়েছি। প্রতিটি পাতায় তিনি লিখে রেখেছেন তাঁর ছন্দোবদ্ধ ভাব। একটিও সাদা পাতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু আমার এই ঘরে, পিসিমার এই ঘরে, রাত্রির এই ঘরে বসে পেয়েছিলাম সেই খাতা থেকে ঝরে পড়া মাসিমার এক লিপিসমষ্টি। স্বামীকে লেখা তাঁর সেই বহু পুরাতন পত্রের অক্ষর ভাসা ভাসা। বক্তব্য স্পষ্ট। তিনি অপেক্ষায় আছেন। সুসময়ের আশায় তিনি এই বিচ্ছেদ সহ্য করে যাচ্ছেন। তাঁর সন্তানেরা ছোটো ছোটো। তাঁদের নিয়ে তিনি খুব বিব্রত। তাঁর ভালো লাগে না। এরপর প্রণাম জানিয়ে সর্বশেষে এসে গেছে তিনটি শব্দের একটি বাক্য—আমার চুম্বন নিও। মাসিমার হাসির মধ্য থেকে ঝরে পড়ছে সেই স্নিগ্ধ লিপ্তি। শোণিমা ছাদের মেঝেতে মায়ের পাশে বসে পড়েছে। অদূরে মুণ্ডিতমস্তক সুজনদা অপর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে কোনো একটা হিসেব বুঝে নিচ্ছে। তখনই তো টের পেলাম, অপর্ণার মধ্যে নেমে এসেছে মাসিমার অবিকল ঠাম। তাকে খুব সহজেই বলে ফেলা যায় অঙ্কুরিত মাসিমা। গত এক যুগ ধরে এখানে আসছি। প্রথমে সুজনদার সঙ্গে কিন্তু তার পরে একা একা শত-সহস্রবার। কী ভয়ংকর পুরনো ইমারত। দোতলার কোনো কোনো অংশে অশথের কচি কচি মুখ। সেই মুখ লক্ষ্য করেছি কতবার কতদিন। এসে এসে দেখেছি ফ্রক ছেড়ে অপর্ণা আর শোণিমা কী ভাবে শাড়ির বহুবর্ণ উদারতায় চলে যেতে পেরেছে। ওদের সোফায় বসে কফির কাপ হাতে নিয়ে গল্প করতে করতে হরিধ্বনি শোনা যায় বারংবার, এই বাড়ির সামনের পথই মহাপ্রস্থানের পথ। কতদিন সুজনদার সঙ্গে তুষার আর গিরিরেখা নিয়ে কথা হয়েছে। সুজন-দার অজস্র আরোহণের পর যেসব প্রত্যাবর্তন ছুটির বৃত্তে ধরা পড়েছে সেইসব প্রত্যাবর্তন আমি লক্ষ্য করেছি। একবার তার অন্তত দুজন বন্ধু অভিযান শেষ করে যখন নেমে আসছে তখনই জয়ের অসতর্কতার ফল

ফলে। অপর্ণাদের বাড়িতে বসে আমি সারা সকাল ধরে শুনেছিলাম সেই তুষারে ঝরে পড়ার বিবরণ। সুজনদা অকম্পিত গলায় দেখিয়ে দিয়েছিল অভিজ্ঞতা কতখানি মর্মান্তিক হতে পারে। তখন হয়তো সেই বিবরণের অবসরে অপর্ণা একবার এসে সফেন কফি রেখে চলে গেছে। শোণিমা একাধিকবার এসে দাদাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে কলের জল যাবার সময় হল, স্নান করা দরকার। সুজনদা তুষারে যাদের চিরকালের জন্য রেখে আসতে বাধ্য হয়েছে তাদের ছবি দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্নানঘরে চলে গেছে। আমি হয়তো পাঁচ মিনিট বই হাতে করে বসে আছি। তখনই মেসোমশাই বাজারের থলি রেখে আমার সামনে এসে বসেছেন। শুধু বিশ্বাসের কথা নয়, বিপন্নতার কথাও একের পর এক এসে ভিড় করেছে।

—অপুকে কত বললাম বি. এ.টা শেষ কর। সে কিছুতেই পরীক্ষায় বসবে না। এই তো পরশু থেকে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

—কেন, বসতে চাইছে না কেন?

—বলছে আমার গানের ফাইনাল সামনে। ওটা ভালো করে দিতে হবে। এর কী উত্তর দেবে বলো? বি. এ.টা শেষ করে গানের ফাইনালে বসা যায় না?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কোনোদিনও সহজ ছিল না। সেদিনও আমি নীরব থাকতে চেয়েছিলাম। তখনই ছাদের ঘর থেকে ভেসে আসছিল তানপুরার আশ্রয়ে সমৃদ্ধ অপর্ণা। আমি শুধু বলার মধ্যে বলেছিলাম—শোণিমা তো ভূগোলে অনার্স পড়ার সুযোগ পেল—আপনি তো হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

—তা ঠিক, তা ঠিক। যেখানে আশা করিনি সেখানেই হয়ে গেল।

মেসোমশাই জানতেন না, কিন্তু আমি জানতাম অপর্ণার বি. এ. না দেবার পেছনে গানের প্রভাব ছিল না, ছিল ভুবনের প্রভাব। জানার মধ্যে তেমন কোনো কৃতিত্ব ছিল না। আমি ভুবনকে শত-সহস্রবার অপর্ণাদের বাড়িতে দেখেছি। সে মফঃস্বল থেকে বাসে চেপে চলে আসত।

তার হাতে থাকত এসরাজ। ভুবন অপর্ণাদের বাড়িতে চা খেয়ে গল্প করে এসরাজ নিয়ে উঠে যাচ্ছে এবং তাকে অনুসরণ করে অপর্ণা চটি পরছে এ দৃশ্য দেখতে দেখতে বহু পুরনো হয়ে গিয়েছিল। অপর্ণাদের বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে গানের স্কুল। সেখানে অপর্ণা গলার এবং ভুবন যন্ত্রের চর্চা করত। তুমি এসরাজ বেছে নিলে কেন ?—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে ভুবনের উত্তর ছিল—এসরাজের চল খুব কমে যাচ্ছে। কেউ কেউ না শিখলে একেবারে হারিয়ে যাবে।—শুনেছিলাম ওদের গানের স্কুলে একজনই বৃদ্ধ আছেন যিনি এসরাজ শেখান৮ তিনি ভুবনদের অঞ্চলেই থাকতেন। শোনা যায় ভুবনের বাবা গামছা পরে শহরে এসে চারতলা বাড়ির মালিক হয়েছেন। তবে কি তিনি এসরাজের শিক্ষককে বাড়িতে এনে ছেলেকে শেখানোর মধ্যে বিলাসিতা খুঁজে পেতেন ? না কি ভুবনই এসরাজ বয়ে এনে স্কুলে বসে শেখার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল প্রাণ ? এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া তত সহজ ছিল না। কিন্তু সহজেই পাওয়া যেত ভুবন-অপর্ণার সহাবস্থান। আমিও দেখেছি তৃণভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ভুবন-অপর্ণা। তখন প্রায় দুপুর। কিংবা বিকেলে বাবা একদিন দেখে ফেললেন।—অপু দেখি একটা ছেলের সঙ্গে জলের পাড়ে গিয়ে বসল।—বাবা মাকে নিম্নস্বরে কথাটা বাড়ি ফিরে এসে বললেও আমার কানে এসেছিল। মা বিস্মিত না হয়ে বাবাকে বিস্মিত করতে চেয়েছিলেন।—এ তো তবু ভালো, জলের পাড়ে গিয়ে বসতে দেখেছ। সেদিন কাকে যেন বলতে শুনলাম, বিধুবাবুর বড়ো মেয়ে একটা ঝোপের মধ্য থেকে বেরোল। সঙ্গে একটা ছেলে ছিল।

কখনও কখনও এসরাজ অপর্ণাদের বাড়িতে রেখে যেত ভুবন। সুজনদা সেই ক্ষণিক আয়তন বুকে চেপে ধরে হাসতে হাসতে ছড় টানত। মেসোমশাই বিশ্বাস থেকে বিপন্নতায় এবং বিপন্নতা থেকে বিশ্বাসে বারে বারে ফিরে যাচ্ছিলেন। তাঁর তেমন কোনো সাধারণ দৃষ্টিপাত দানা বাঁধার অবসর পেত না। না হলে তিনিও আমার এবং আর সকলের মতো বুঝতে পারতেন তাঁর অপু কেন পড়ার রোদ্দুর থেকে গানের ছায়ায়

ফিরতে চেয়েছিল নির্দ্বিধায়। মেসোমশাই লোক বেছে বেছে কথা বলতেন এবং কথা বলতে বলতে থেমে যেতেন। যেন যা তিনি বলতে চেয়েছিলেন তা বলার আদৌ কোনো অর্থ আছে কিনা এমন কোনো প্রশ্ন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ভুবন তাঁর বাছাই-তালিকায় নাম ওঠাতে পারেনি। আমি কোনোদিনও দেখিনি, মেসোমশাই একা বসে ভুবনের সঙ্গে বিস্তৃত।

একদিন সকালে বাইরের ঘরে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। সুজনদা শহরে থাকলে এই সময় এই ঘরেই থাকে। কাগজ হাতে ধরে আপাদমস্তক পাট করার ধৈর্য তার আজও যথেষ্ট আছে। সে ঠিক খুঁজে-খুঁজে বের করে এমন সব খবর যেগুলির মধ্যে সদ্যঃপাতী শিশিরের গন্ধ। হয়তো সপ্তাহে একটাই তার অনুসন্ধানের ফলরূপে জমা পড়ে: কিন্তু এই বিপুল জাঁকজমকের মাঝখানে সেইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছের হাত ধরে কখনও কখনও চলে যাওয়া যায় পৃথিবীর প্রকৃত প্রত্যুষগুলিতে, সুজনদার একথা না মেনে উপায় নেই। কেউ ঘরে না থাকলেও আমি বসে পড়ি। টেবিল জুড়ে তিন-চারটি দৈনিক আর সাপ্তাহিক। কদমগাছ লুটিয়ে পড়ার পর খোলা জানলা দিয়ে ঘরে আলো লুটিয়ে পড়ার কোনো বিরাম নেই। সেদিনও ছিল না। দৈনিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি সত্যিই বাস্তব-বাদী। না হলে নক্ষত্রের প্রভাব নিয়ে নিয়মিত ভাবে কিছু না কিছু বলার জন্য জায়গা ছাড়ত না। আমার অভ্যাস আছে কাগজ পেলে নক্ষত্র বিষয়ক জায়গাটি একবার উলটে দেখে নেবার। এ সব উলটে দেখে নিতে যতটা সময় লাগে তার মধ্যেও কোনো জনপ্রাণী দেখতে পাইনি। শেষে যখন দেয়াল-তাকের পরদা সরিয়ে বই দেখছি, পরিচিত বইগুলির পরি-চিত স্তরের ফাঁকে কোনো অপরিচিত গ্রন্থ ঢুকে আছে কিনা তা নির্ণয় করার চেষ্টা করছি, তখনই তো প্রথম মানুষের পদশব্দ পেলাম।—কী খবর শোণিমা? কাউকে দেখছি না?

—আমরা কোণের ঘরে ছিলাম। তুমি কতক্ষণ এসেছ?

—এই কিছুক্ষণ আগে। সুজনদার ফিরতে তো এখনও দেরি আছে?

—না, তাড়াতাড়ি ফিরবে। দাদা তো এবার অফিসের কাজে গেছে।

—অপর্ণা কোথায় ? ওকে মনে হচ্ছে আগের দিনও দেখিনি।

শোণিমার উত্তর দিতে দেরি হচ্ছিল। যেন সে কী ভাবে বলবে তা ঠিক করে উঠতে পারছে না। আমিও তার অস্বস্তি দেখে ও প্রসঙ্গ থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলাম।

—কফি আছে তো ? থাকলে কফি করো।

—আমি কফি করে আনছি। তারপর তোমাকে একটা কথা বলব।

চায়ের কথা থাক। তা এতদিন ধরে মাসিমা, শোণিমা এবং অপর্ণা এই তিনজনের মধ্যে যে-কোনো একজন তৈরি করে আমাকে দিয়েছে। কখনও কখনও সুজনদার দ্বারাও চা হয়ে আমার হাতে পৌঁছেছে। কফির বেলায় হিসেবটা কিন্তু অন্যরকম। আজ পর্যন্ত যতবার এ বাড়িতে কফি খেয়েছি ততবার না হলেও প্রায় ততবার অপর্ণাকেই কফি বানাতে দেখা গেছে। তার হাতেই প্রথম আমি ফেনিল কফি দেখেছিলাম। অনতিদূরের একটা বাড়ির অধিকারে যে গাছটা পড়ে গেছে তার শরীরে বেল ঝুলছে। না কি বলব বহু ঝুলন্ত বেল মিলে তার শরীর হয়ে উঠেছে। মানুষের উপকারী বেল মানুষের খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটোদের এই বেল-গাছ দেখিয়ে কত শত ভয় দেখানো হয়ে গেছে। সেই যে মুণ্ডিতমস্তক এক বিপ্র খড়ম পায়ে দিয়ে বেলগাছ আগলে রাখেন সারা রাত। তিনি কোথায় ? অপর্ণারা বহু বছর ধরে এই বাড়িতে আছে। অপর্ণা কি ছেলে-বেলায় খুবই দুরন্ত ছিল ? হয়তো শোণিমার মতো শান্ত ছিল আর শোণিমাই ছিল দুরন্ত। মাসিমা কি তাদের ঘুমোনোর আগে খোলা জানলার পাশে বসে ঘুম আনতে যাননি ? আনতে গিয়ে তাঁর কথা বলে ওঠেননি যিনি মাথা কামিয়ে পৈতে নিয়ে খড়ম পায়ে বেলগাছ থেকে নেমে আসেন ? তবে তো বেল আরও কত সাহায্য করল। ঘুম আনার পথ করে দিল। অপর্ণাদের বাড়ির পুজোয় একশো আটটি পাতা লাগে। সেও কিন্তু ওই বিল্বপত্র। আর শ্রীফল শুধু তো উপকারী নয়, সুঠাম সেই-সঙ্গে। গোল, দৃঢ় এবং সারবান। শোণিমা কফি নিয়ে ঢুকলে সেই স্তব্ধ ঘরে বসে মনে হয়েছিল অপর্ণা বিল্বস্তনী।

—একটু দেরি হল, নালীকদা। স্টোভ খালি ছিল না। আতপ চালের ভাত বসানো ছিল।

শোণিমা কফি দিয়ে উলটো দিকে বসল। শাড়ির কোণ দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে তার চেষ্টা ছিল কী করে কথায় ফিরে আসা যায়। এইসব মুহূর্ত বড়ো মূল্যবান। একজন যৌবনবতী ভাবছে কী ভাবে কথা বলবে।

—শোণিমা, আমি তোমাকে একটু সাহায্য করব ?

—কী সাহায্য ?

—তুমি যে কিছু একটা বলতে গিয়ে পারছ না সেই ব্যাপারে সাহায্য ?

—না, তা ঠিক নয়, তবে ভাবছি কেন এমন হয় ?

—তোমার দিদির কিছু হয়েছে ?

—দিদি তো ভেতরের ঘরে শুয়ে আছে। কারও সঙ্গে কথা বলছে না।

—কেন, হয়েছে কী ? অবশ্য যদি কোনো অসুবিধে না থাকে।

—যা হবার তাই হয়েছে। দিদি ভুবনদার সঙ্গে এই প্রথম তাদের বাড়ি গিয়েছিল। ভুবনদা তার মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। সেদিন ফিরে এসে দিদির যে কী উচ্ছ্বাস। কত বড়ো বাড়ি। কত ভালো বাড়ি। সবাই কত ভালো। ঠিক তার পরদিন ভুবনদা এল। এসরাজটি নিয়ে চলে যাবার সময় দিদিকে বলল—মা বলেছেন, মেয়েটির রঙ বড়ো চাপা। আমাদের বাড়িতে আজ পর্যন্ত এত চাপা রঙ আসেনি। দিদির এখন থেকে থেকে একটাই কথা—আমি কী ভুল করেছি! দাদাও নেই যে তাকে কিছু বোঝাবে।

—শোণিমা, তোমার দিদিকে যদি ডাকি, আসবে ?

—এখন ? মাথা খারাপ, উঠবেই না। বললাম না শয্যাশায়ী।

আমি যে অপর্ণাকে ডেকে আনার কথা কেন তুলেছিলাম তা আজও জানি না। ডাকলে যদি সে সত্যিই উঠে আসত কী আমি তাকে বলতে পারতাম ? কিছুই বলতে পারতাম না। মনে মনে হয়তো কিছু কথা বুনে ফেলেছিলাম। কিন্তু সেগুলো মন থেকে বের করে দিলে সব সময় শুনতে

তেমন ভালো লাগে না। 'কী ভুল করেছি'—এই আক্ষেপ শুনে হঠাৎ রামায়ণের কথা মনে হয়েছিল। রামায়ণ কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে একটা ভুলের ওপর। সে ভুল দশরথের। দশরথ সেই ভুলটা না করলে রামই বা কোথায়, রামায়ণই বা কী। কী সেই ভুল? মৃগয়ায় গিয়ে তিনি অন্ধ-মুনিতনয়কে হরিণ ভেবেছিলেন। ফলে শরযোজনা। ফলে মুনিপুত্রের মৃত্যু। আর তার ধাক্কায় অন্ধমুনির অভিশাপ—দশরথও পুত্রশোকে শেষ হয়ে যাবেন। অভিশাপ ফলাতে পুত্রহীনের পুত্র হল, রাম এলেন এবং এল সাতকাণ্ড রামায়ণ। তাই ভুলের মূল্য আছে। এসব হাঁটতে হাঁটতে ভাবা যায়, ভাবতে ভাবতে নিজের কাছে নিজেকে পরিষ্কার করে তোলা যায়, পাওয়া যায় সন্তাপের যুক্তি, কিন্তু জানানো যায় না শয্যাশায়ী নারীকে ডেকে এনে। আমি সেদিন শোণিমাকে কিছুই বলতে পারিনি। ওকে একটু একা থাকতে দিও।—উঠে আসার আগে আমার অন্য কোনো কথা অনুচ্চারিত ছিল।

ওই শ্রুতির পর বেশ কিছুদিন অপর্ণাদের বাড়িতে আমি যেতে পারি-নি, যেতে চাইনি। এমন কিছু কিছু ঘটনা আছে যেগুলির সঙ্গে নিজের কোনোরকম সম্পর্ক না থাকলেও বারেবারে সেগুলির দায়ভাগ গোপনে গোপনে যেন নিজের ওপরেও কিছুটা এসে পড়ে। ওই ঘটনাটি, ওই বিছানা জুড়ে দিবালোকেও শুয়ে থাকার ঘটনাটি, ওই এক যুবতীর মুখ থেকে অন্য যুবতীর পরাজয়ের ঘটনাটি আমার ত্রিসীমানায় না ঘটলেও আমি আমার দায়িত্ব এড়াতে পারি না। কী সেই দায়িত্ব জানি না, কেউ আমাকে জেনে নিয়ে বলে দিতেও পারবে না, কিন্তু এক গোপন অস্বস্তি আমাকে ওই বাড়ির দিকের পথ থেকে অন্য সব পথে নিয়ে গিয়েছিল। যেসব বাড়িতে বহুদিন ধরে যাবার কোনো ইচ্ছে হয়নি অন্য সব পথ ধরে সেসব বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ানো ধূমপানের সমপরিমাণ এক নেশায় পরিণত হয়েছিল। কৈশোরে যেসব ভবনের মধ্য দিয়ে আমাদের লুকোচুরির বীথি গঠিত হয়ে-ছিল, গঠিত হয়েছিল কিছু বিকেলমণ্ডিত সন্ধ্যা সেইসব ভবনের অনেকেই আজ ঠিকানা পালটেছে। তবু যারা যারা আছে নতমস্তকে তাদের দরজায়

উপস্থিত হওয়ার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম এক অপূর্ব প্রায়শ্চিত্তের কাজ। এক ধোপা তার পরিবার নিয়ে বহুদিন হল প্রায় প্রতিবেশী। আমাদের বাল্য-কৈশোরে তার হরিণ ছিল। তার মাতৃভাষায় হরিণ মানে হিরণ। আমাদের দলবদ্ধ বন্ধুরা সেই চিত্রিতগাত্র হরিণের বিরক্তি উৎপাদনের জন্য যা যা করা দরকার সবই করে যেত অম্লান ভঙ্গিতে। ছুটে আসত রজক-দুহিতা। বাধা দিত আমাদের এবং বোঝাত হিরণকে কষ্ট দিলে হিরণ ওপরে চলে যাবে। হিরণ একদিন সত্যিই ওপরে চলে গেছে। আজ তাকে সেযুগের স্বর্ণমৃগ ভেবে নিতে আমার কোনো বাধাই আর দাঁড়াতে পারে না। হরিণের স্মৃতি নিয়ে সেই ধোপাদের অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াতাম।—কী নালীকবাবু, আপনি? বহুদিন পরে এলেন?

—হ্যাঁ রামু, অনেকদিন পরে এলাম। তুমি ভালো আছ তো?

—এই আপনাদের আশীর্বাদে একরকম চলে যাচ্ছে।

রজকদুহিতাকে দেখতে পাইনি। প্রশ্ন করতেও ইচ্ছে করেনি। জানি তো প্রশ্ন করলে বহু দূরে কোথাও তার স্বামী ও সংসারের তৈলচিত্র পাব। রামু ঠেলা বোঝাই করে কাপড়-জামা দিয়ে এবং মাঝেমাঝে এমন এক জায়গায় পৌঁছে যায় যেখানে জলের মাঠ আছে, জলের ঘাট আছে, হাওয়া আছে, আছে রৌদ্রবিকাশ। আগে তো মেয়েকে ঘরে রেখে, হরিণের কাছে রেখে রামুর সস্ত্রীক যাত্রা ছিল। পরে কী করত রামু আমার ইচ্ছে থাকলেও তা জিজ্ঞেস করিনি। কোনো এক বিপন্ন সিঁড়িতে উঠে ডেকে উঠতাম—প্রফুল্লদা আছ?—সাড়া দিত কুকুরেরা প্রথমে, তারপর প্রফুল্লদা, —কে এলি রে?

—আমি নালীক, প্রফুল্লদা। তোমার কুকুর সামলাও।

অনিরুদ্ধ দরজা দিয়ে তিনটি কুকুরের সঙ্গে প্রফুল্লদার বহিঃপ্রকাশ।

—আরে কুকুর কিছু করবে না, ভয় নেই। তুই তালে বেঁচে আছিস। কুকুরই প্রফুল্লদার নিত্য সঙ্গী। হোটেলে খেতে যাচ্ছেন, পেছনে যাচ্ছে তিন সারমেয়। যখন অনুষ্ঠানে বাজাতে যেতেন অনুষ্ঠানকেন্দ্র যদি বাড়ির কাছে হত, মণ্ডপের বাইরে ফুটপাথে অপেক্ষা করত ত্রয়ী। প্রফুল্লদার তপো-

মূর্তি দেখা যেত না, তা ছিল অনুভবের বস্তু। এই টাকভরা, ফতুয়া ও পাজামাধারী প্রবীণ যখন মঞ্চে উঠে মাউথ-অর্গানে আনতেন বিমান অবতরণের শব্দ, কিংবা যুদ্ধসঙ্গীত কিংবা রাজহংসের জলতান অসংখ্য হাত থেকে অভিনন্দনের শব্দ উঠত।

—দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ভেতরে আয়, কুকুর কিছু করবে না।

—তুমি ভালো আছ প্রফুল্লদা? তোমাকে অনেকদিন দেখিনি। শুনেছিলাম গলা নিয়ে কষ্ট পাচ্ছ। এখন কেমন আছ?

—আমি খুব ভালো আছি। আমি কোনোদিনও খারাপ থাকি না। লালুটা মাঝে খুব ভুগে উঠল। অনেকগুলো ইঞ্জেকশান দিতে হয়েছে। ভেতরে যাইনি। প্রফুল্লদার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনেক কথা হয়েছিল। মুখে তিনি অনেক নতুন ঝংকার এনেছেন। চলে আসার আগেও বলতে সাহস হয়নি, প্রত্যাখ্যাত নারী বিছানায় পড়ে আছে, তার শব্দ তুলেছ?

আমার এই অনুপস্থিতির অবসরে, আমার এই পরিভ্রমণের পর্বে আমি একদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে আসছি। পোস্ট অফিসের পরিচিত ছেলেটি হাতে তুলে দিল শেষ ডাক।—নালীক, বাড়ি ফিরে অপুকে দেখলাম। দেরি না করে অপুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।—সুজনদার চিঠির শুরুটা এখনও দেখতে পাচ্ছি। সুজনদা প্রভূত নিসর্গের মধ্য থেকে চিঠি দিয়েছিল। সেবার তার যাত্রায় ছিল ভ্রমণের নিরাপত্তা। অপুকে নিয়ে সুগম পাহাড়ি পথে শুধু ঘুরে বেড়ানো। সেবার কোনো শিখরের দিকে তাকিয়ে কোনো মৃত্যুময় আরোহণ নয়। এরই মধ্যে খবর ছিল। শীত অগ্রাহ্য করে এক পূজারীর অনুরোধে তাঁর তানপুরা নিয়ে অপু একদিন বসেছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে তার ভজন শুনে, তার মাথায় নেমে এসেছিল পূজারীর আঙুল। আর মনে আছে চিঠির সর্বশেষ বাক্য —আমাদের ফেরার দিন এখনও স্থির হয়নি। ফেরার দিন তখনও অনির্দিষ্ট জেনে আমি অনেকদিন বাদে সুজনদার বাড়ির পথ ধরেছিলাম। পথ থেকে দেখা যায় পুরনো ছাদে নতুন বুক ঠেকিয়ে শোণিমা দাঁড়িয়ে আছে। সে হয়তো এই সময় অনেক কিছু লক্ষ্য করে। সে নিশ্চয়ই

দেখতে পায় গঙ্গার ওপারের মন্দিরের চূড়া এখনও কত শিল্পগত। অদূরের আকাশে যেসব পাখি উড়ছে তারা ঊর্ধ্বে যতই মহিমার অংশ হোক সেতুর ওপরে বা নিচে নেমে এলে দেখা যায় তারা আদতে শকুন। ভেঙে-পড়া এবং প্রাচীন সব গৃহমণ্ডলীর অনন্ত সমষ্টির এক কোণ দিয়ে কী ভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে বহুতল ইমারত। এরই মাঝে কোনো কোনো জনপদের হৃদয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা নারকেলগাছ তার পাতাকে বাতাসের আকস্মিক ধারায় ডুবিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু শোণিমা নিশ্চয়ই জানে নিশ্চয়ই দেখেছে সমস্ত কিছুকে যা ছন্দোবদ্ধ করে রেখেছে তা চিমনির অবিরাম এবং নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস। উচ্ছ্বাস এত ঊর্ধ্বগামী, এত তামসিক হতে পারে? আর সেই বিকেলেও অঞ্চলের আকাশ এমন সব মেঘকে ধারণ করেছিল যারা মূলে প্রশান্ত, যারা নতুন বুকের যুবতীগুচ্ছকে পুরনো সব কল্পনায় ভরিয়ে রাখতে পারে। ছাদ থেকে পথের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা গেলেও ছাদের মানুষেরা যতটা সজাগ থাকলে সব কিছু দেখা যায় ততটা জাগ্রত থাকে না। মাটি থেকে খানিকটা ওপরে উঠলেই চোখের মধ্যে এসে যায় ভাবনার পাখা। তখন যা দেখছি তা কোনো পূর্বাপর দেখা নয়। কোনো কোণ দেখা, তার কোনো ভাবনাকে দেখা। ছাদে দাঁড়িয়ে শোণিমারা পথের পাশের কোনো ঘর দেখে, ঘরের পাশের কোনো ঘর দেখে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসা কোনো মানুষের চলে যাওয়া দেখে। কখনও দেখে গভীর মদ্যপ, কখনও দেখে দেহাতি বিবাহ তথা গ্রাম। আর দেখে শব ও তার বাহকবর্গ। হরিজনদের শববিষয়ক যত বাজনার আকৃতি! কদাচিৎ, হয়তো সমগ্র যৌবনে দু-একবার, হাতি বা উটের নিঃশব্দ হেঁটে যাওয়া। শোণিমাকে বলা হয়নি যে পাহাড় স্থির থাকে, কিন্তু উট চলে যায়—এই মর্মে আরমেনিয়ার একটি গল্প আমি ওই ছাদে বসেই পড়ে ফেলেছিলাম। সেই বিকেলে আমি যখন সুজনদাদের বাড়ির গলিতে ঢুকছি তখন শোণিমার চোখ পথের অন্যদিকে ছিল। সেখানে সজ্জিত ঘোড়ার পিঠ থেকে অশ্বারোহী নেমে ঘোড়ার কিছু একটা দেখে নিচ্ছিল। প্রতিযোগিতার মাঠ আমাদের খুবই কাছে।

সুজনদা নেই, অপর্ণা নেই। বাড়ি নিশ্চয়ই নিঃশব্দ হয়ে থাকবে। একতলার ছেলেরা গলিতে বল খেলতে প্রস্তুত হচ্ছে। ওই আসন্ন কলরোল কি আসীন নৈঃশব্দ্যকে মুছে দিতে পারবে? নৈঃশব্দ্য তো নিশ্চয়ই। শোণিমা ছাদে স্থির। আর দোতলার ঘরগুলিতে মাসিমা মেসোমশাই। আমার উপস্থিতিতে খুব একটা দাম্পত্যবাক্য কোনোদিনও দেখিনি। বিকেল তো, মাসিমা নিশ্চয়ই উঠে ঠিকে ঝিকে লক্ষ্য করছেন। মেসো-মশাই দুপুরে ঘুমোনোর যে অভ্যাস তার মধ্যে না গিয়ে জানলা পরিপূর্ণ-ভাবে খুলে দিয়ে স্থির হয়ে এবং গ্রন্থহীন হয়ে যদি বসে থাকার চেষ্টা করেন তবেই সেটা স্বাভাবিকতা হবে। এতদিন বাদে হঠাৎ গিয়ে দোতলায় দাঁড়ানো অস্বস্তিকর। তার চেয়ে ভালো না থেমে একেবারে ছাদে উঠে যাওয়া। আমি সেই প্রথম দোতলায় না থেমে ছাদে গিয়ে দাঁড়ানোর মনোবল পেয়েছিলাম।

পেছন থেকে পা টিপে টিপে গিয়ে রমণীকে ভয় দেখানোর প্রলোভন বহু পুরনো। আমি সেই প্রলোভন জয় করতে পারব এমন বিশ্বাস আমার ছিল না। ফলে আমি শ্রোণিগাঢ় ঠামের দিকে তাকিয়ে বলে ফেললাম—কী শোণিমা, অত ঝুঁকে পড়েছ কেন?

শোণিমা চমকে গিয়ে পাঁচিল ছেড়ে দিয়ে ফিরে তাকাল।—নালীকদা, তুমি? এতদিন কোথায় ছিলে? কালও মার সঙ্গে তোমার কথা হচ্ছিল।

—কেন, আমি বাড়িতেই ছিলাম। কোথাও চলে যাইনি তো।

—তবে এতদিন আসনি কেন? আমরা কী দোষ করলাম?

—মাঝে মাঝে না এলে আসাটা যে কত প্রয়োজনের তা বোঝা যায়।

—মার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

এই প্রশ্ন করে শোণিমা খুবই স্বাভাবিক একটা কৌতূহল প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আমি চট করে বলে ফেলতে পারলাম না যে আমি দোতলায় না থেমে সোজা চলে এসেছি এই বিকেলের ছাদে। শোণিমা ছাদে নির্লোক ছিল। তাই সব কথা বলা যায় না। রমণীর কাছে রমণীয়

হওয়া সহজ, সহজ হওয়া যে কঠিন এ আমি ভালো করে বুঝে গেছি। আমার রবহীনতা দেখে শোণিমা আবার সেই প্রশ্ন করল—মার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি? মা তো ঘুম থেকে উঠে গেছে। আমি যখন ছাদে আসি মা টিয়াকে গম দিচ্ছিল।

—রাস্তা থেকে দেখলাম তুমি অনেকটা ঝুঁকে পড়েছ। পুরনো বাড়ি পুরনো ছাদ। দেয়ালের ভেতর দিয়ে অশথের পাতা বেরিয়ে আসছে। তোমাকে সাবধান করার খুবই প্রয়োজন ছিল। দেরি না করে তাই সোজা ছাদে চলে এসে তোমাকে ডাকলাম।

শোণিমা এ পাড়ায় সূক্ষ্ম ছুঁচের কাজে সিদ্ধি লাভ করেছে, এ মন্তব্য অমূলক নয়। জানি না আমার এই উত্তর তার কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। সে শুধু বলতে পেরেছিল—চলো নিচে যাই।

—এখন আর নামতে ইচ্ছে করছে না। একটু ছাদে বসি। একটা ছাদ থাকা মানে অনেক কিছু থাকা। তুমি যদি একটা মাদুর আনতে পার ভালো হয়। শোণিমা স্বেচ্ছায় কিংবা ছুটে ছুটে মাদুর আনতে চলে গিয়েছিল এ বললে সত্য থেকে সরে আসা হবে। এ বাড়িতে প্রথম দিনে তার যে লজ্জা দেখেছিলাম তা কয়েক বছরে আগত যৌবনভারে এখন আর ঠিক সেই লজ্জা নেই, তা যেন পরিশোধিত হতে হতে বুদ্ধির সংমিশ্রণে একটি নিজস্ব গোপনতায় মিশে গেছে। মাদুর আনতে যাবার আগে সে অন্তত দু মিনিট ছাদের পাঁচিলে তার সমস্ত ভার রেখে দাঁড়িয়ে-ছিল। আর মনে পড়ে অদূরের কোনো কারখানার ভিতর থেকে উঠে এসে ছড়িয়ে পড়েছিল সাইরেন।

বিকেলের ছাদের মধ্যে চিরকালের কোনো কথা ঘুরে বেড়ায় না। বরং সাম্প্রতিক আরও একটু প্রসারিত হয়ে আরও একটু সহনীয় হয়ে যায়। পথ দিয়ে আসতে আসতে ধুলো, ধোঁয়া, গরিমা আর গ্লানির যেসব তাপ শরীরে মিশে যায় বিকেলের ছাদে সামান্য অবস্থিতির ফলে সেসবের জ্বালা আর থাকে না। কত দিন পরে বিকেলের ছাদে এমন এক বিজনতা পেলাম যা স্বল্লায়ু জেনে বড়ো ভালো লাগে? বহুদিন পরে আমি ছাদে

হাঁটছি, কোনো লোক নেই, কোনো কথা নেই। কিন্তু লোক আসবে, কথা শুরু হবে, এমন এক প্রতিশ্রুতি আছে, ইঙ্গিত আছে। ইঙ্গিত সম্বল করে ইতিউতি হেঁটে বেড়ানো সেদিনের সার্থকতা ছিল। ছাদ আছে, ছাদে ঘরও আছে। ওই ঘর প্রতিদিন সকালে ধুয়ে ফেলা হয়। কখনও মাসিমা, কখনও শোণিমা, কখনও কখনও অপর্ণা নিজেদের হাতে ওই ঘর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে। ওই ঘরে প্রতিদিন সম্পদশালী ধূপকাঠি জ্বলে ওঠে। তার আগে কয়েকটি পট, দু-একটা মারবেল পাথরের মূর্তি কমলা রঙের কাপড় দিয়ে করতলে রেখে সুমার্জিত করা হয়। তারপর হাতের তেলোতে সেন্ট ঢেলে সেই পট আর মারবেল পাথরে সেন্ট মাখানোর কাজ। এই কাজ প্রতিদিন করে দিয়ে যায় মাসিমা বা শোণিমা বা অপর্ণার সকালের অঙ্গুলি। আমি দেখেছি অনামিকার পৃথক ভূমিকা থাকে, মধ্যমার পৃথক ভূমিকা থাকে, তর্জনীর পৃথক ভূমিকা থাকে এবং থাকে অনামিকা-মধ্যমা-তর্জনীর সম্মিলিত প্রতিপত্তি। ওই ঘরে মাঝেমাঝে এক বৃদ্ধের দ্বারা হোমাগ্নি জ্বলে ওঠে। তখন মাসিমা শোণিমা অপর্ণা এই তিনজনের যে-কোনো একজন দোতলা থেকে ঘিয়ের শিশি নিয়ে বৃদ্ধের হাতে তুলে দিলে ঘৃতাহুতি হয়। একশো আটটি বিল্বপত্র তিনজনে বেছে বেছে সরিয়ে রাখলে সেই সংকলনে বৃদ্ধের হাত গিয়ে পৌঁছয়। আর ধোঁয়া হয়, তাপ হয়, অস্থিরতা আসে। সর্বশেষে বৃদ্ধ প্রত্যেককে ডেকে ডেকে যখন হোমের টিপ পরিয়ে দেন তখন কপালের সেইসব কালো দাগের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারি সুন্দর এসে পড়ে, তাকে ডেকে আনা যায় না। কপালের সেইসব ছোটো ছোটো কৃষ্ণচক্র নিয়ে শোণিমারা শান্ত হয়ে বসে পড়ে না। তারা একবার দোতলায় নেমে যায়, একবার উঠে আসে। একজন হালুয়ার থালা হাতে করে নেমে গেল, একজন শূন্য থালা নিয়ে উঠে এল লুচি নিয়ে যাবে বলে। এই অবিরাম যাতায়াত রাতের কোনো এক বাঁকে এসে নিশ্চয়ই থেমে যায়। কিন্তু তখনও থাকে সেই ছোটো ছোটো কৃষ্ণচক্র। সেই কৃষ্ণচক্র নিয়ে শোণিমারা শয্যাশায়ী হয়। ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমেরও কিছু কিছু নিজস্ব বিস্তার আছে। তার দ্বারা চক্রের কিছু অব-

লুপ্তি ঘটে। পরের দিন সকালে সেই অস্পষ্ট চক্র আমি দেখেছি। নারীর কপালের সেইসব দাগ দেখে নীরবতা হত।

শোণিমা মাদুর না এনে এনেছিল শতরঞ্জি। ছাদের কিছুটা জায়গা ঝাঁট দিয়ে তবে শতরঞ্জি পাতা হল।—নালীকদা বোসো। এই বইটায় একটু চোখ বুলোও। আমার এবারের জন্মদিনে দাদা বইটা দিয়েছে। যা গরম পড়েছে আমি একটু হাতে মুখে জল দিয়ে আসি।

শোণিমা জানে বিকেলের ছাদে বসার জায়গা পেলে হাতে বই না থাকলেও আমার সময় কেটে যায়। শোণিমা জানে আমি এই বিজনতা-গুলিকে সজনতার পূর্বাবস্থা বলে মানি। হাত পেতে যে বইটি নিয়ে-ছিলাম তা বিদেশী বই। আকারে ছোটো। তবে শ্যাম এবং সুপর্ণা নারীর ইতিহাস পাওয়া যাবে, নামে এই নিশ্চয়তা আছে। বই যেমন-তেমন করে উলটে মধু সংগ্রহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। আমার অভিজ্ঞতায় এমন মাঝেমাঝে ঘটে গেছে। সেই বিশ্বাস নিয়ে শোণিমা পরিমার্জিত হয়ে ফিরে আসার আগেই পাতা ওলটানোর কাজে নেমেছিলাম। বন্য মানুষদের মধ্যে অবিবাহিত এবং অনুর্বর নারীদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়। সেইসব বিবাহনির্ভর সমাজে মেয়ে যখন শরীরসচেতন হয় তখন সেই বাগ্‌দত্তাকে তার পুরুষ পুঁতির মালা দিয়ে জড়ানো কাঠের পুতুল দিয়ে যায়। দু-তিন মাস বাদে সেই পুরুষ অস্থির হয়ে পড়ে। বলে ওঠে—'আমি চাই আমার বউ বিছানার ভেতর থেকে উঠে আসুক।' তখনই তো সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। অন্তিম প্রস্তুতি শুরু হয়। কোনো এক বর্ষীয়সী এসে মেয়েকে নানা উপদেশে সমৃদ্ধ করে।—অতিথিদের সেবা করবে, শাশুড়ি কোনো কাজের ভার দিলে তা তাড়াতাড়ি বুঝে নেবে, পরিচ্ছন্ন থাকবে, স্বামীকে মানবে আর রান্নায় নিখুঁত হবে।—উপদেশের পরে বিয়ের আচারোৎসব শুরু হয়ে যাবে। শুরু হবে বৃষহত্যা, উপহারপ্রদান, গান, নাচ এবং খাওয়াদাওয়া। তার-পর মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হবে আসন্ন স্বামীর বাড়িতে। যাবার পথে তার পা যেন ভূমি স্পর্শ না করে। গ্রাম যতই দূরের হোক সে বাহিত হয়ে

যাবে। যখন সে পৌঁছবে তার সঙ্গিনীরা চিৎকার করে উঠবে। সেই চিৎকার শুনে বর ছুটে পালিয়ে লুকিয়ে পড়বে কোথাও। সে যে তার সামনের অপরিচিতাকে ভয় পায়। সে যে বিশ্বাস করে বিবাহের রাতে দুর্যোগের সম্ভাবনা আছে। নারীর সেই মায়াবী ক্ষেত্রকে স্পর্শ করলে এমন কি তার মৃত্যুও ঘটে যেতে পারে। সেই কারণে নারীর সঙ্গে প্রথম রাত সরলভাবে অতিবাহিত করে স্বামীর সম্পর্কিত কোনো তরুণ। বলা হয়ে থাকে যে এই নিরামিষ রাত্রিবাসের দ্বারা সে বিবাহকে ভক্ষণ করে ফেলে। আদতে সে পাত্রীর মধ্যে দিয়ে দেয় এক গুহ্য উজ্জ্বলতা যার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তার পরের দিন স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয় নির্বিচারে। প্রথম রাত্রির সেইসব মূক তরুণের সংখ্যা শুধু কি বনেই আবদ্ধ? বিকেলের নির্বন জগতে এই প্রশ্ন প্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রিয় হয়ে উঠেছিল সেবারের আগের বারে শোণিমার জন্মদিনে সুজনদার দেওয়া ভারতীয় সর্প-বিষয়ক বইটি। সে বইটিও আমি নিজে দেখিনি, শোণিমাই দেখিয়েছিল। তবে ছাদে নয়, রাত্রির দোতলায় বাইরের ঘরে। সে বইটিতে নাগপঞ্চমী থেকে শুরু করে সর্পপ্রধান নানা উৎসবের কথা ছিল। সাপের বিষ কী ভাবে তুলে নেওয়া হয়ে থাকে তার সব ছবি ছিল। নানা সাপের ডিম পাশাপাশি সাজিয়ে একটি ডিম্বরেখা—তাও ছিল পরিষ্কারভাবে। ওখানেই তো ভীরু সাপের কথা পেয়েছিলাম। তারা লুকিয়ে থাকে প্রায়ই। বাইরের দিকে এদের কৃষ্ণ দাগ আছে। মফঃস্বলে বাড়ির বাগানে এদের প্রবেশ ঘটে যেতে পারে। তা হলেও এরা প্রায় শব্দ না করে একসময় মিলিয়ে যায়।

শোণিমা যে ফিরে এসেছে তা টের পেলাম কাপ রাখার শব্দে। সেদিন ফেনাঢাকা কফি পাইনি। শোণিমা শতরঞ্জির এক কোণে বসতে গিয়ে বলে ফেলেছিল—দাদা না থাকলে কফিটা বাড়িতে খুব একটা চলে না। দাদাও নেই, কফি যে নেই সে খেয়ালও কারও নেই। কাল ঠিক আনিয়ে রাখব। আজ তুমি চা খাও।

শোণিমা সাজেনি, কিন্তু সুস্থ হয়ে এসেছে। সে প্রমাণ সর্বাঙ্গে ছিল।

কোনো কোনো মেয়ে বোধ হয় পেরে যায়। এই দেখা গেল আবদ্ধ আর বর্ণচ্যুত। হয়তো সামান্য বিরতির পর আত্মবিশ্বাসী আর নীল হয়ে উঠল। আমরা এমনভাবে বসতে পেরেছিলাম যাতে অন্তত প্রতীচীর আদ্যন্ত দেখা যায়। শকুনেরা ঘুরে ঘুরে একটা দিক আবৃত করে রেখে যাচ্ছে। ওই দিকেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নল এবং নলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে শর্বরী থোকা থোকা। আমাদের দুজনের ঠিক মাথার ওপর দিয়ে বহু উচ্চতায় পাখিদের একটি মালা মিলিয়ে যেতে গিয়ে যে নির্মাল্যের সূচনা করে শোণিমা কি সেই সূত্রে কথা বলেছিল।—তুমি নাগলিঙ্গম ফুল দেখেছ ?

—দেখা তো দূরের কথা এই প্রথম নাম শুনলাম। কেন বলো তো ?

—আমাদের ক্লাসের সুতপা আজ নাম করছিল। রাজভবনের সামনে নাকি নাগলিঙ্গমের গাছ আছে। খুব সুন্দর নাকি এর ফুল। ফুলের গন্ধও নাকি অসাধারণ। আর একটা কথা বলল সুতপা। ফুলের স্তবক কোথা থেকে বেরোয় বলো তো ?

—ভালো লোককে জিজ্ঞেস করেছ। আমি এসব ব্যাপারে মহামূর্খ।

—কাণ্ডের শরীর ফুঁড়ে ফুলের স্তবক বেরিয়ে আসে। ভাবছি দিদি ফিরে এলে একদিন দুজনে মিলে নাগলিঙ্গম দেখে আসব। তুমি কি জান দিদি এখানে নেই ? দাদা এবার দিদিকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে।

—জানি। সুজনদার চিঠি পেয়েছি। আমি শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি আমরা বাড়ির ছাদে বসে আছি, আর ওরা পৃথিবীর ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার বন্ধু সুতপা কোথায় থাকে ? এইসব অঞ্চলে ?

—না না, এখান থেকে অনেক দূরে থাকে। ওর বাড়ি থেকে এয়ারপোর্ট খুবই কাছে। কেন বলো তো ? ওকে কিছু বলতে হবে ?

—যদি ভুলে না যাও একটা কথা জিজ্ঞেস কোরো। ও কি নিজে, মানে স্বচক্ষে, নাগলিঙ্গম দেখেছে, নাকি শুনে এসে তোমাকে বলেছে।

—ঠিক বলেছ তো ! ফুলের গুণপনা শুনতে গিয়ে এই কথাটাই আর জেনে নেওয়া হয়নি।

আমাদের সংলাপের মাঝখানে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। ছাদে যদি সন্ধ্যে হয় তবে পৃথিবীর সন্ধ্যা থেকে যত গুহ্য উজ্জ্বলতা উঠে আসে। দূরে বহু-তল ইমারতের অসংখ্য খোপে আলোর খোঁপা। পথ দিয়ে তখন যে হরিধ্বনি চলেছিল তা ছিল সহিংস। লক্ষ্যের কাছাকাছি চলে এসে বাহকেরা হিংসার সহযোগে ক্লান্তি ঝরায়। ঠিক তখনই লক্ষ্য করি পশ্চিম আকাশে একটিই ফুল ফুটেছে! সাদা ফুল। আমি স্বচক্ষে সেই ফুল সেই শুক্রক্ষেত্র দেখেছিলাম। মনে পড়ে গিয়েছিল ভেনাস-৪-এর কথা যে আড়াই কোটি মাইল দূরের ওই উদয়নে অক্ষত দেহে নেমে যেতে পেরেছিল।

—শোণিমা, সুজনদা আমাকে কী লিখেছে জান?

—কী?

—পাহাড়ের ওপরে এক মন্দিরে বসে অপর্ণা গান করেছে।

—কই, দাদা আমাদের এসব কিছু লেখেনি তো?

—ওর গান শুনে ওখানকার পূজারী ওর মাথায় হাত রেখেছেন।

সেদিনের শ্রাদ্ধবাসরে আমি দোতলা থেকে উঠে গিয়ে যেখানটাতে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম অপর্ণার মধ্যে নেমে এসেছে মাসিমার ঠাম, সেখানে কোনো দ্বীপের দৃশ্য ছিল না। ভূখণ্ডের বদলে জলমহিমা ছিল। সেই সর্ব-গ্রাসী জলমহিমার দিকে তাকালে মানুষের করণীয় কিছু থাকে। বুঝতে পেরেছিলাম এমন কিছু আছে যা আমিই হয়তো সম্পন্ন করে দিতে পারি, এবং তা যদি করে ফেলা যায় তবে আর যাই হোক পৃথিবী অশুদ্ধ হবে না। শ্রাদ্ধবাসরে সেই ভারি রাতে দাঁড়িয়েও কানের পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল বাক্যের পর বাক্য।—অপু দেখি একটা ছেলের সঙ্গে জলের পাড়ে গিয়ে বসল।—এ তো তবু ভালো, জলের পাড়ে গিয়ে বসতে দেখেছ। সেদিন কাকে যেন বলতে শুনলাম, বিধুবাবুর বড়ো মেয়ে একটা ঝোপের মধ্য থেকে বেরোল। সঙ্গে একটা ছেলে ছিল।—নালীকদা, তুমি যে বলেছিলে বাবার এখন কোনো মৃত্যু নেই।—কিন্তু জলমহিমার দিকে তাকালে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে স্পষ্ট দেখা যায়

পূজারীর আঙুল যার মাথায় নেমেছে তার হাতে তানপুরা, তার ডাইনে বাঁয়ে গিরিরেখা এবং চিরতুষার। আমি হয়তো ভুল করে ফেলতে পারি, কিন্তু আমি দেরি করব না। অপর্ণার সঙ্গে সুজনদার কথা শেষ হলে অপর্ণা আবার মা আর বোনের কাছে ফিরে গিয়ে বসে পড়ে। তখন ছাদের মুণ্ডিতমস্তক একমাত্র পুরুষের কাছে গিয়ে আমি বলতে পারলাম —কাল সন্ধ্যেবেলায় তুমি বাড়ি আছ তো? আমার একটু কথা আছে।

—সন্ধ্যেবেলায় আমাকে তুই পাবি না। একটু রাতের দিকে আসবি?

—আমার কোনো অসুবিধে নেই। আমি যদি আটটায় আসি?

—খুব ভালো হয়। আটটায় এলে আমাকে তুই নির্ঘাত পাবি।

সত্যিই রাত হয়েছিল। আমাদের বাড়ির দিকে নয়, দূরে কোথাও চারিদিক-কাঁপানো শব্দ হয়েছিল। এই শব্দের পর মাসিমা পা গুটিয়ে নিয়ে ভালোভাবে বসলেন। আমিও বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। রাস্তা অন্ধকার। যেসব কুকুর আমাকে চেনে তারা শান্ত ছিল। যারা চেনে না তাদের কেউ কেউ ডেকে উঠেছিল। আমাদের পাড়ার কোনো ঘরে পূর্ণ-শক্তির আলো জ্বলতে দেখেছিলাম এমন কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি না। কিন্তু গলিতে ঢুকেই বুঝতে পারলাম সেই বিপুল নিদ্রার পটভূমিতে যে ঘরটির আলো নেভেনি, তা আমাদের বাইরের ঘর। বাইরের ঘরের বাইরের জানলার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন। এই অতন্দ্রতা দেখে আমার ভয় হচ্ছিল মা হয়তো আমাকে বলে বসবেন—লোহা ছোঁও, আগুন ছোঁও, জামাকাপড় ছেড়ে ফ্যালো।

পরের দিন অফিস থেকে বেরিয়ে ফুটফুটে বিকেল পেয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক করলাম, তখন আর বাড়ি ফিরব না। হেঁটে একটু ঘুরে তবে বাড়ি ফেরা। বাড়ি হয়ে সুজনদাদের বাড়ি যাওয়া। কোথায় হাঁটা যায়? কোন্‌দিকে যাব? ডানদিকে ঘুরলাম। ডানদিকে যাওয়া মানে মানুষের যত্নে বানিয়ে তোলা অজস্র গাছ আর লম্বা একটুকরো জলপথ পেয়ে যাওয়া। অজস্র গাছ আর জলপথের ঠিক গায়ে যে ঘেরা জায়গাটি

এখনও আছে তাকে আমরা শৈশবে উদ্যান বলে জেনেছিলাম। সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা একটি বর্গক্ষেত্র ভূমি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে। বর্গক্ষেত্রের একদিকে সিঁড়ি এবং অন্যদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে পথ ভূমি পর্যন্ত। ঢালু পথের শেষে এবং ভূমির শুরুতে ঝকঝকে বালির বিছানা পাতা থাকত। আমরা শৈশবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে বর্গক্ষেত্রের মাঝখানে বিজয়গর্বে দাঁড়িয়ে পড়তাম। এই দাঁড়ানোটা ছিল সামান্য সময়ের স্থিতি। তারপরেই একে একে সেই তৈলাক্ত তথা মসৃণ পথের ওপর সারা শরীর সঁপে দিয়ে হু-হু করে নিচে নেমে আসতাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পারঙ্গম ছিল। তারা উদ্যানের প্রকৃত প্রাণ দেখিয়ে দিতে পারত। তারা সিঁড়ি দিয়ে বর্গক্ষেত্রে না উঠে মসৃণ আর পিছল পথ দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যেত। সেই পারঙ্গম শিশুদের কারও সঙ্গে এত বছর বাদে আমার কোনোরকম যোগাযোগ নেই। সেই নেমে-আসা ঢালু পথ এবং ভূমির মিলনক্ষেত্রে ঝলমলে বালির পরিবর্তে ঝলমলে ঘাস গজিয়েছে। বহু গাছের তলায় এবং জলপথের পাশে লম্বা লম্বা কাঠের আসন। ফুটফুটে বিকেলে একটিও খালি নেই। খালি পাবার আশাও করিনি। এক-একটা আসন ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা বৃদ্ধদের অধিকারে। এক-একটা আসনে বর্ষীয়সী সধবারা পরিপূর্ণ। কোনো কোনো আসনে কোনো সম্মিলন নেই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অচেনা হয়ে বসে আছে। শুধু একটা আসন একজনেরই দখলে ছিল। কিন্তু সেখানে হঠাৎ গিয়ে বসে পড়ার কোনো সুযোগই ছিল না। সারা আসন জুড়ে যে ফুটফুটে বিকেলে ঘুমিয়ে থাকে তাকে ডাকার ক্ষমতা আমার নেই। আশ্চর্য এই যে আমি সেদিন কোনো কাঠের আসনে কোনো তন্ময় যুগলমূর্তি দেখিনি। তারা জলের পাড়ে মাটিতে ছিল। গাছের তলায় মাটিতে ছিল। কদাচিৎ কেউ কেউ ছিল ঝোপঝাড়ে।

জলের ওপারে চলে যেতে পারলে বসার জায়গা পাওয়া যাবে। এপারে দাঁড়িয়ে তা বারে বারে বুঝতে পেরেছিলাম। ওপারে যেতে গেলে আবার খানিকটা পিছিয়ে ঘুরে যেতে হবে। যখন পিছিয়ে ঘুরে যাচ্ছিলাম

তখন বকুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। গাছের তলায় বকুল পড়ে ছিল। এই ছোটো ছোটো সুগন্ধ তারা আমি পিসিমাকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে বহু বিকেলে কুড়িয়ে নিয়েছি। পিসিমার অজস্র কাজের মধ্যে এও এক কাজ ছিল। তিনি বার্লির কৌটোয় নিমের খড়কে রাখতে, রেখে রেখে ভরিয়ে তুলতে যতটা সময় নিতেন ঠিক ততটাই সময় নিয়ে তিনি বকুলের পর বকুল গেঁথে গেঁথে বৃত্ত পূর্ণ করে দিতেন। তাঁর ঘরে টুলের ওপর মারবেল পাথরের যে কৃষ্ণমূর্তি ছিল সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাঁর নিঃশব্দ বকুলচর্চা একসময় শেষ হত। তখন তিনি কী করতেন? থেমে যেতেন না। ডিমের কুসুমের মতো উরু অনাবৃত করে উরুতে তুলো রেখে সলতে পাকিয়ে নিতেন। এক-একটা সলতে মধ্যমার থেকেও লম্বা ছিল। সেগুলির দুপাশে এমন সব সূচীমুখ ছিল যা দেখে অদৃশ্য অগ্নির কথা মনে পড়ে যেত। পিছিয়ে ঘুরে যেতে গিয়ে যে অগ্নি দৃশ্যমান হল তা খণ্ডমেঘের রঙ হয়ে থেমে আছে। জলের ওপারে গিয়ে কিছু কিছু চিনতে পারছিলাম। ওই তো স্নানঘাট। জল কালো হয়েছে কিন্তু স্নানার্থীর সংখ্যা বিপুল। রেললাইন পার হয়ে গামছা-সর্বস্ব ছেলেরা এসে দাঁত মেজে ডুব দিচ্ছে। প্রভূত ডুব ও সাঁতারের পাশাপাশি একজনই কোমর পর্যন্ত জলকে থামিয়ে রেখে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকার ভাবটিকে আনতে পেরেছিল পুরো-পুরি। কোথাও না থেমে এগিয়ে গেলে চেনা-অচেনার হিসেবটা তত কঠিন আর লাগে না বলে এগোচ্ছিলাম। ঘাট নেই, ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে জলে নেমে যাবার ধারা নেই, এমন দু-তিনটি জায়গায় মেয়েরা সজ্ঘবদ্ধ হয়েছিল। যত গরিব ততটাই গতিময়ী হয়েছিল। সজ্ঘবদ্ধ হলে লজ্জা যে অনেক কমে যায় সে প্রমাণ রেখেছিল। জল শুধু জল তাদের ভিতরে গিয়ে গিয়ে এনেছিল মধ্যরাতের একটি মণ্ডল।

এরই খুব কাছে একইভাবে আছে সেই বেদী। বেদীর ওপর গেঁথে দেওয়া আছে পাঁচটি কামান। পঞ্চ কামানের কালো-কালো মুখগুলি ঠিক সমকোণে বসানো কোনো দিনও ছিল না। তাহলে তাদের মুখ দ্বীপের দিকে থাকত, দ্বীপ থেকে একটু বেঁকে থাকতে পারত না। দ্বীপ এই জল-

পথে আছে এটুকুই জানি, কবে থেকে আছে তা আজও জানতে চাইনি। কোনোদিন দেখিওনি মানুষের গড়া জলপথের ওই ছোট্ট দ্বীপটিতে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চলে গেছে। বরং শুনে এসেছি ওই অনাহত ভূমিখণ্ডের জন্মে ওঠা তরুলতায় এমন সব সাপ আছে যাদের বিষ দুর্নিবার। একবার কি দুবার দেখেছি সাঁতার কাটতে কাটতে কেউ একা-একা দ্বীপে উঠে দুদণ্ড পাড়ে দাঁড়িয়ে আবার নেমে পড়েছে জলে। দ্বীপের ভিতরে চলে গিয়ে কিছুক্ষণ অন্তরালে চলে যেতে সেও পারেনি। কোথাও একটু বসে থাকার যে ইচ্ছে অফিস থেকে বেরিয়ে ফুটতে শুরু করেছিল তার পূর্ণোদয় হয়েছিল। আমি বেদীর ওপরে উঠে বসে পড়লাম। আমার বাঁদিকে কামান, আমার ডানদিকে কামান। আমার সামনে দ্বীপ, আমার পেছনে রেল-লাইন। এবং আমার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমকে মথিত করে দিয়ে যাচ্ছিল হাওয়া। আর কিছু নয়, এই পুণ্য গতি চেয়েছিলাম। এখান থেকে কিছুটা দূরে ঘেরা মাঠে কত দৌড়ঝাঁপ দেখেছি। একদিন দেখতে গিয়ে এক সাদা বৃদ্ধকে দেখেছিলাম। মাথার টুপি থেকে শুরু করে পায়ের জুতো পর্যন্ত তাঁর সবকিছুই ছিল সুধবল। ঘেরা মাঠের দিকে যাচ্ছি এবং যেতে যেতে আমরা কয়েকজন দু পাশের গাছ থেকে লাল লাল বড়ো বড়ো ফুল ছিঁড়ছি। ফুল ছেঁড়া বারণ। আশেপাশে দারওয়ান নেই। আমাদের অপরাধজনিত সুখ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। তখনই বড়ো বড়ো ঘাসের মধ্য থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি সাদা বৃদ্ধ। তিনি শান্ত স্বরে বলে উঠে-ছিলেন—তোমরা কী করছ?—ওই স্বর শোনার পর আমাদের আর কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। আমরা নতমস্তকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম দৌড়ঝাঁপের কেন্দ্রে। তখনই তো সেই শান্ত স্বরে আবার শোনানো হল—কোথায় যাচ্ছ? এদিকে এসো।—আমরা ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে বৃদ্ধের দিকে তাকালাম। তিনি এবার আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। এবার ভয়ের সঙ্গে এসে মিশল শ্রদ্ধা। কী সুন্দর তাঁকে দেখাচ্ছিল, কী শুভ্র আর সনাতন। একে একে সবাই তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি পেছন ফিরে যেখান থেকে এসেছিলেন সেই দিকে চলতে শুরু করলেন। আর

আমরা তাঁকে নবোদ্যমে অনুসরণ করলাম। কিছুদূর হাঁটার পর তলার সবুজে দেখা দিয়েছিল নির্ভার ঐশ্বর্য। তেমনই কোনো ক্ষেত্রে তিনি বসে পড়লেন। আমরা তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসলাম। তিনি প্রথমে কোনো কথা না বলে যে সময় নিয়েছিলেন সেই কিছুক্ষণের মধ্যে আস্তে আস্তে জন্ম নিল মুখমণ্ডল, হাত-পা এবং বুক। সবই নীরবতার। আমরা সেই নবজাতককে সম্মান করতে শিখলাম। তিনি ধীরে ধীরে আমরা যে ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তার পরিচয় দিলেন। বললেন তার ইতিহাস। শেষে তার নাম বললেন।—কলাবতী। তোমরা কলাবতীকে ছিঁড়ে ফেলছিলে। কিন্তু কেন? ফুলের যে চেতনা আমাদের চেতনার পাশাপাশি থেকে চৈতন্যের বিরাট আয়োজনকে সাহায্য করে যাচ্ছে তিনি তাকে আমাদের সামনে যেন সমাগত করেছিলেন। তারপর আমাদের প্রত্যেকের নাম জেনে নিয়েছিলেন। আমার নাম শুনে আমার দিকে তাকিয়ে একটি করুণাময় ভঙ্গিতে তিনি বলে উঠলেন—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। লজ্জা কোরো না। 'সান্ত্বনা' বানান করো তো? আমার নির্ভুল বানান শুনে তিনি আমার হাত টেনে নিয়ে তার হাতের মধ্যে রেখেছিলেন। তাঁর পক্ষিকোমল হাতের তাপ হাতে নিয়ে আমি বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলোর ঘেরা মাঠে গিয়ে দেখি কালো কালো ছোটো ছোটো প্যাণ্ট পরে মেয়েরা লোহার বল ছুঁড়ছে। এ-কথা স্বীকার করব, না করে উপায় নেই, অন্যদিনের মতো সেদিন আর দলবদ্ধভাবে ঘেরা মাঠে বসে ছেলেমেয়েদের বালিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা, অথবা যারা বর্শা ছুঁড়ছে তাদের অহিংস উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করা কোনোটাই আমার হয়নি। কেবলই মনে হচ্ছিল মাঝেমাঝে দলচ্যুত হওয়া ভালো। সেই মন নিয়ে আমি সামান্য অজুহাতে ঘেরা মাঠ ছেড়ে ঘেরা মাঠ ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম যেখানে তা অদূরের সম্পদ। সেই যে লম্বা জলের ফালি তা এঁকে-বেঁকে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ঝুলন্ত সেতু আছে। সেতুর মাঝামাঝি গেলে ইচ্ছে করলে দেখে নেওয়া যেত 'সেতু যে কাঁপে সেই কেঁপে-ওঠা ব্যাপারটা কেমন। আমার কিন্তু সেদিন সে ইচ্ছেটুকুও ছিল না। মনে প্রশ্ন

উঠেছিল, সেতু দোলানো শেষ পর্যন্ত ফুল ছেঁড়ার সমগোত্রীয় কোনো কর্ম কিনা। সেতুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিলাম। আমার চোখ ছিল জলখণ্ডের দিকে। জলখণ্ডের সমস্তরকম নিথরতা মুছে দিয়ে মাঝেমাঝে মুখ তুলত মাছেরা। সেই সব উর্ধ্বমুখে সেতু থেকে ঝরে পড়ত খাবার। খাবার মানে সদ্য কিনে আনা গরম তাপ লেগে থাকা সরু সরু মুড়ি। সেদিন আমি সেতুর ওপর থেকে কোনো মুড়ি ঝরাতে পারিনি। কিন্তু নতমস্তকে অপেক্ষার ফল ফলেছিল। সুদেহী মাছেদের দলটি ধীরে ধীরে এসে ভেসে উঠে ডুবে গিয়েছিল। সে এক উদ্ভাস। আমি সেদিন দলটির পুরোভাগে এমন এক কৃষ্ণ বিশালতা দেখেছিলাম যাকে আজ মীননাথ বলতে কোনো কষ্ট হয় না। সন্ধ্যের মুখে সেদিন কামানের বেদী থেকে উঠে পড়ে বাড়ির পথ ধরতে সবিশেষ কষ্ট হয়েছিল।

মুখ হাত ধুয়ে জলখাবার খেয়ে বেরোতে যাব, মা এলেন। হাতে নীল চিঠি।—অণিমার চিঠি এসেছে দেখেছিস? তোকে যেতে লিখেছে। অনেক দিন তো কোথাও যাসনি। ছুটি নিয়ে ঘুরে আয় না।—দিদি আর কী লিখেছে? দেখি চিঠিটা। অনেক দিন বাদে চিঠি এল। আমার সহোদরা বলে কিছু নেই। জ্যাঠামশাইয়ের বড়ো মেয়ে আমাদের দিদি। আমার থেকে কয়েক বছরের বড়ো। মাইল-মাইল-ছড়িয়ে-থাকা একটি গিরিরেখার খুব কাছে থাকে। স্বামী অফিস-সূত্রে যে বাড়ি পেয়েছে তার সামনে পেছনে বহু জায়গা আছে। সেসব ক্ষেত্র দম্পতির বৃক্ষচর্চায় সমৃদ্ধ। দিদির চিঠিতে বহু গাছের নাম থাকে, বহু ফলের খবর থাকে, বহু পাতার চিত্রোপম বর্ণনা থাকে। বৃক্ষের জগতেও বিবাহের দ্বারা, মিলনের দ্বারা যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে দিদি তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা সম্ভব করে তোলে। সে ডাকঘরের খাম ব্যবহার করে না। তার নিজস্ব নীল খামে তার সবুজের খবর আসে। সেদিনের চিঠি জুড়ে ছিল বহু আতার আসন্ন উদয়ের সংবাদ। আতায় ছেয়ে যাবে বাগান এমনই এক ভবিষ্যৎ দেখে দিদি ফুল্ল ছিল। শুধু তাকে ভাবিত করে রেখেছিল বাদুড়েরা। দিদি জানে আতা আমার কত প্রিয় ফল।

এই শহরে আমি কত ঘুরে ঘুরে আতা পাবার চেষ্টা করেছি। দিদি যে যেতে লিখেছে তার পেছনে আতাজগতের ডাক আছে। এখনই আবার বেরোচ্ছিস ? —মার এই প্রশ্ন গত রাতে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকার যে শ্রম তাতে সিক্ত মনে হল। —তুমি চিন্তা কোরো না, একটু বিশেষ কাজে বেরোচ্ছি। দেরি হলে আমার খাবার ঢেকে রেখে খেয়ে নিও।

পদাতিকের পক্ষে কোথাও সময়ে পৌঁছনো তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। আমি ঠিক আটটাতেই সুজনদাদের দোতলায় পৌঁছে গেলাম। শ্রাদ্ধের ঠিক পরের দিনই বোঝা যায় না মৃত্যু যাকে নিয়ে যায় তার অভাব। তখনও যে নানা মানুষ আসে যায়, ওঠা-নামা করে এবং এটা চলতে থাকে অন্তত এক সপ্তাহ। সুজনদাদের দোতলায় অ-পারিবারিক এবং অত্যুজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। যারা দূর-দূর থেকে এসেছে তাদের কোনো কোনো শিশুর কান্না ভিতর থেকে ভেসে আসছিল। আর যে ব্যাপারটা ঘটেছিল তা প্রায় সঙ্ঘটনের পর্যায়ে পড়ে যায়। যে বাড়িতে আগের দিন শ্রাদ্ধবাসর বসেছিল এবং পরের দিনও মৎস্যগ্রহণের আসর বসবে, যে বাড়িতে আত্মীয়স্বজনেরা সত্যিই ভিড় করেছে, সে-বাড়ির বাইরের ঘরটি আমি গিয়ে মনুষ্যশূন্য দেখেছিলাম। মেঝেতে সতরঞ্জি পাতা ছিল, এদিকে-ওদিকে দু-তিন জোড়া কাপ-ডিশ পড়ে ছিল, কিন্তু ছিল না কেউ যাকে আমি জিজ্ঞাসিত করে দিতে পারি—সুজনদা আছে ? আসলে এ-রকম যে কখনও কখনও হয় তার কারণ ঠিক তখনই ভিতরটা খুবই ভরে ওঠে, একেবারে পূর্ণ হয়ে যায়। সেই আপূর্যমাণ অন্দর সৃষ্টি হয় বলেই কাজের বাড়ির সদরেও নেমে আসে এই অভাব, এই বিজনতা, এই অপেক্ষা করে থাকার অস্বস্তি। আমি বসে বসে আরও প্রস্তুত হবার চেষ্টা করেছিলাম।

একসময় সিঁড়ি থেকে কেউ সুজনদার নাম ধরে ডেকেছিল। পরের দিন সকালের জন্য সে মাছ নিয়ে এসেছে। এই মৎস্যনীরবতা দেখতে ভিতর থেকে প্রায় সবাই উঠে এল। সুজনদা মাছ দেখে বাইরের ঘরে আসার আগে পর্যন্ত আমার প্রস্তুতি অব্যাহত হয়েছিল।

—তুই এসে গেছিস। চল আমরা ছাদে যাই। অপু, নালীক এসেছে। আমাদের জন্য একটু কফি করিস।

ওই মীনজনিত সমাবেশের মধ্যে আমি অপর্ণাকে ঠিক দেখতে পেলাম না। বাইরের ঘরে যে সতরঞ্চি পাতা ছিল সুজনদা সেটা গুটিয়ে হাতে নিয়ে নিল। আর-এক হাতে নিল ঝাঁটা। সতরঞ্চি পাতার আগে সুজনদা যখন ছাদ ঝাঁট দিচ্ছিল, আমি নক্ষত্রের প্রাচীন পরম্পরা ধরে ধরে একটি শ্বেতবর্ণের মেঘকে এগিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

—কী কথা নালীক? খুব বড়ো কোনো কথা, না কি খুব ছোটো ছোটো কথা?

—তুমি হাসছ, সুজনদা। কিন্তু আমি ভাবছি কী ভাবে বললে মানায়।

—তুই সভা-সমিতিতে দাঁড়িয়ে কিছু বলছিস না, আমার কাছে বলছিস।

—সমস্যা তো সেখানেই। ব্যক্তিগত কথা বলা সবচেয়ে কঠিন। তবু কদিন ধরে প্রস্তুত হবার চেষ্টা করেছি। আচ্ছা শোনো, তোমাদের আপত্তি না থাকলে আমি অপর্ণাকে চাই। অপর্ণার আপত্তি না থাকলে আমি অপর্ণাকে চাই। এই আমার সার কথা, এ ছাড়া আর কিছু বলার নেই।

—তোর সমস্ত ব্যাপারে আমার সমর্থন আছে। এটা তার বাইরের কিছু নয়। ঘটনাচক্রে অপু আমার বোন বলে শুধু একটা কথাই বলব, তুই এখনই একবার অপুর সঙ্গে কথা বলে নিলে সবচেয়ে ভালো হয়।

সুজনদার এই বাক্য শেষ হবার পর এমন কিছু সময় অতিক্রান্ত হল না যাকে বেশিক্ষণ বলা চলে। ওই অন্ধকারে দু হাতে দু কাপ নিয়ে অপর্ণা যখন এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার হাত যদি কেঁপে গিয়ে থাকে তবে তাকে আমি কোন শব্দে দাঁড় করাব এই ভাবনা খুব বড়ো হয়। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত থেকে কাপ নিয়ে মেঝেতে রাখি। অপর্ণা কাজ শেষ করে ফিরে যাচ্ছে, আমি সুজনদার পাশে বসেছি আবার, ঠিক তখনই সুজনদা তার কাপ হাতে করে উঠে দাঁড়িয়ে অপর্ণাকে ডেকে

ফেলল।—অপু শোন, নালীক তোর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায়। তুই বরং ওর সঙ্গে কথা বল, আমি নীচে গিয়ে দেখি মাছগুলো কোথায় রাখল।

সুজনদা এত তাড়াতাড়ি এভাবে আমাকে অপর্ণার সামনে ফেলে দেবে তা বোধ হয় সুজনদা নিজেও জানত না। আমাদের বাড়িতে পুজোর সময় আরতির মুহূর্তে দুরকম প্রদীপ জ্বলতে দেখে এসেছি। প্রথমে পঞ্চ-প্রদীপ। একই সঙ্গে গাঁথা পাঁচটি দীপাধারে পিসিমার উরুতে রেখে বানানো সলতেগুলি জ্বলে উঠত শান্তভাবে। আমরা নির্ভয়ে তার তাপ নিতাম। তারপর একটি ছোটো এবং গোলাকার ক্ষেত্রে কর্পূর রেখে কর্পূরদীপ জ্বালানো হত। তখনই দেখা যেত প্রজ্বলন সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে অগ্নি তার পূর্ণরূপে প্রকাশ পেত। এত ছোটো ক্ষেত্র থেকে এত দ্রুত এত প্রজ্বলন দেখে আমরা তাপ নিতে গিয়ে ভয় পেতাম। কিন্তু ভয়ের পাশা-পাশি এমন এক গন্ধ ফুটে উঠত যাতে জড়িয়ে থাকত কর্পূরশুভেচ্ছা। সেই শুভেচ্ছা থাকত বলেই আমরা আগুনের কাছে করতল রেখে সেই তল বুকে মাথায় ঠেকানোর কাজটি শেষ করতে পারতাম।

—বোসো অপর্ণা।

অপর্ণাকে জিজ্ঞেস না করেই আমি কফি ভাগ করলাম, ডিশ তার কাছে রাখলাম।

—এই একটু আগে চা খেয়েছি। ওইটুকু কফি আবার ভাগ করতে গেলে কেন।

সতরঞ্জির একেবারে শেষ মাথায় অপর্ণা বসে পড়েছে। কফি আর কতটুকু কালক্ষেপ এনে দিতে পারে? কিছুক্ষণের মধ্যে আস্তে আস্তে জন্ম নিল মুখমণ্ডল, হাত-পা এবং বুক। সবই নীরবতার। কী বলব তা আমার কাছে পরিষ্কার, কোনো কুয়াশা নেই তার মধ্যে। কী করে বলব সেটাই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। যেভাবেই বলতে যাই নিজের কানেই তার আর কোনো গুরুত্ব থাকছিল না। শেষে প্রজ্বলিত হলাম।—অপর্ণা, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমি তোমাকে চাই। বহু বছর ধরে তোমাদের বাড়িতে আসছি। এ তো সত্যি যে আগে কখনও এ ভাবনা

আসেনি। কিছুদিন ধরে শুধু ভাবছি, তোমার যদি অনিচ্ছে না থাকে আমি তোমাকে চাইব। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

আমি জানি, আমার এই থেমে থেমে বলে-যাওয়া কথাগুলো অপর্ণা কোনো দিনও আশা করেনি। আমিও আশা করিনি ঠিক সেই মুহূর্ত উজ্জ্বল গৈরিকে ঢাকা শ্রমণের লক্ষ্যের দিকে হেঁটে যাবার ছবি এবং শব্দ এত বছর বাদে মনে পড়ে যাবে। লম্বা জলের ফালি বাঁদিকে রেখে দিন-শেষে যে শ্রমণ তার বিহারের দিকে এগিয়ে যেত তার হাতে থাকত একটি গোলাকার আধার। ওই আধারে থেমে থেমে সে আঘাত করলে বুম-বুম শব্দ হত। একটি শব্দের পর আর একটি শব্দ আসতে যে সময় নিত সেই সময়ের মধ্যে এমন একটা শূন্যতা ছিল যা দিগ্বিজয়ী। অপর্ণা তার কফির ডিশ উপুড় করে রেখে তার ওপর দিয়ে আঙুলের দাগ কাটছিল। দাগ কাটতে কাটতে সে এক সময় ভেসে উঠল এবং আমি ঝুঁকে পড়ে বুঝতে পারলাম জল তার চোখ থেকে বেরিয়ে নিচে এগিয়ে আসছে।—আমার কিছু বলার নেই, নালীকদা। তুমি মাকে বলো। হাওয়া, রাত, খণ্ড খণ্ড মেঘ এবং নক্ষত্রের এত নির্মাল্যের তলায় বসে এর চেয়ে ভালো উত্তর আমি আশা করিনি। আঙুল দিয়ে তার ডিশের ওপরের আঙুলগুলি তুলে নিয়ে আমার বাঁ হাতের তালুতে রাখলে সে অবিচলিতই থেকে গেল। প্রথম দিকে সে হারমোনিয়াম বাজাতে পারত না। প্রথম যখন এ বাড়িতে এসেছিলাম মনে পড়ে তার গানের জন্য হারমোনিয়াম টেনে নিয়েছিলেন মাসিমা। 'তুমি মাকে বলো'—এই কথার মধ্যে সেই পুরনো নির্ভরতা নবশক্তিতে দুলে উঠেছিল। আমার বাঁ হাতের তালুতে অপর্ণার ডান হাত তুলে এনে রাখার পর আমার ডান হাত তার ওপরে রেখে আমি যে বেষ্টনীর সৃষ্টি করি তাকে স্বল্পায়ু করার যে-কোনো রকম চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল। এমনই এক সঙ্ঘবদ্ধতার সময়ে অপর্ণা তার নতদৃষ্টিকে একবার তুলে আমাকে দেখেছিল। সে বোধ হয় তখনই বলতে চেয়েছিল—তুমি দেখি সান্ত্বনা বানান করে ফেলেছ!

এক সময় আমি নিজেই বেষ্টনী ভেঙে দিয়ে ঠিক ঠিক ছাদে ফিরে

এলাম। সে তার হাত দুটি জড়ো করে কোলের ওপর রাখল। তখন তাকে আমার দু-একটি স্বপ্নের কথা বলার ইচ্ছে হয়েছিল। তখন তাকে আমার দু-একটা জাগরণের কথা বলার ইচ্ছে হয়েছিল। বলার ইচ্ছে হয়েছিল যে নিজেও জানি না কী করে স্বপ্নগুলি জাগরণ ছুঁয়ে থাকে এবং জাগরণগুলি স্বপ্ন থেকে রস সংগ্রহ করে। কিন্তু কিছুই শেষ পর্যন্ত বলতে পারলাম না। অপর্ণার ছাদ থেকে রেললাইন কোনো দিনও দূরে ছিল না। কিন্তু তার মুখোমুখি বসে যখন আর কোনো কিছুই বলা হয়ে উঠছিল না তখন যে ট্রেন চলে যাচ্ছিল তার শরীরের শব্দগুলি ভেঙে ভেঙে, ভেঙে ভেঙে দূরত্বে ডুব দিয়ে উঠেছিল। আমি শুধু বলতে পেরেছিলাম—অপু, গান ছাড়তে পারবে না। তোমাকে আবার শুরু করতে হবে। কী, তাই না?

প্রায় স্বগতোক্তি ছিল উত্তরে—গান তো আমি ছাড়িনি, গানই আমাকে ছেড়েছে।

—তাই যদি হয় তুমি আবার গানকে ডেকে নিয়ে আসবে। রোজ ভোরে উঠে তুমি যদি রেওয়াজ কর গান না এসে পারবে? তোমার কত সুবিধে। তুমি কত সুন্দর একটা ছাদের ঘর পেয়েছ। তুমি তো ভোরে উঠে এই ঘরে চলে আসতে পার?

—ভোরে উঠতে পারলে তবে তো। অনেকবার চেষ্টা করেছি ভোরে ওঠার, কিন্তু পারিনি। তুমি বসো, আমি মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সেদিন রাতের ছাদে মাসিমাও এসেছিলেন। তবে নীচে নেমেই অপর্ণা মাসিমাকে ওপরে পাঠাতে পারেনি। তাঁর আসতে দেরি হয়েছিল। মাসিমা গম্ভীর ছিলেন না, আবার সহাস্য বলতে যা বোঝায় তাও তাঁকে মনে হয়নি। তাঁকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বোঝা যায়, সুজনদা কিংবা অপর্ণা, কারও না কারও কাছ থেকে তিনি যা জানার জেনে এসেছেন। রাতের ছাদে সেই প্রথম তাঁকে একা পাওয়া আর তাঁর মুখোমুখি হওয়া। মাসিমা আমার ঠিক পাশে এসে বসে পড়ে আমার পিঠে হাত রাখলেন।—সব শুনেছি, নালীক। আমার সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে। তোমার মেসোমশাই একথা শুনে যেতে পারলেন না। খুব

ঝড় উঠবে কিন্তু। সেটা চিন্তা করে ভয় হচ্ছে। সামলাতে পারবে তো?

লম্বা জলক্ষেত্রে বহু বিকেলে দেখা গেছে সরু সরু নৌকো খুব তাড়াতাড়ি একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। কোনো কোনো নৌকোয় মানুষের সংখ্যা পাঁচ। কোনো কোনো নৌকোয় দুই বা তিন। আর এমন নৌকোও ছিল যেখানে একজনই মানুষ। এইসব রেখার মতো নৌকোয় যারা বসে তারা প্রত্যেকেই চালক। প্রত্যেকেই পেশী সঞ্চালিত করে শ্রমে ও উদ্যমে দ্রুত এগিয়ে যাবার খেলায় নামে। যেখানে মানুষ একাধিক সেখানে প্রেরণার থেকেও পরিশ্রম অনেক মূল্যবান। সবাই মিলে স্বেদ ঝরিয়ে ছুটে যায় একদিক থেকে অন্যদিকে। যেখানে একজনই মানুষ সেই নৌকোয় প্রেরণাই সব। পেশী প্রেরণার দ্বারাই দুলে ওঠে। যে শিস দিতে দিতে দু হাত ঝরিয়ে ঝরিয়ে দ্বীপের পাশ দিয়ে প্রধাবিত হয়েছে একবার ইচ্ছে হল মাসিমাকে তার কথা বলি।—কী নালীক, চুপ করে আছ, পারবে তো?

—মাসিমা, আমি অপুকে কিছু বলার আগে অনেক ভেবেছি। আপনি ভাববেন না। আমার উত্তরে কি কোনো সন্দীপন ছিল? কোনো তিথি ছিল যাকে প্রাণময় বলা যায়? শ্রাদ্ধের পরের রাতে, নিয়মভঙ্গের আগের যে রাত সেই রাত্রিতে, ছায়াপথ, নীহারিকা, কোন বিশাল দুগ্ধমার্গ, মেগালানিক মেঘমালা, স্মৃতিক্ষেত্র, নাকি সেতু, শকুন-সঙ্গতি, শ্মশান, অশথমথিত ঘরবাড়ি, জানি না কোন মণ্ডল থেকে নির্ভয়তা এসেছিল, আবেগ এসেছিল, শুভেচ্ছার কোনো এক বিস্তার এসেছিল। তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আমার শিরে রেখেছিলেন তাঁর চুম্বন। এই শিরস্ত্রাণ পরে আমি অন্যদিনের মতো অনর্গলভাবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে পারিনি। আমি ধীরে ধীরে নামছিলাম এবং প্রতি পদ-ক্ষেপে ফুটে উঠেছিল চন্দনের গন্ধ। ছাদ থেকে দোতলা পর্যন্ত এই অবরোহণের পর্বে মাসিমাকে সঙ্গে পাইনি। তিনি না নেমে ছাদের ঘরের তালা খুলেছিলেন। কোনো কোনো অবরোহণে থেকে যায় তালা খোলার শব্দ।

বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়ার পর সেদিন অনেকক্ষণ জেগে থাকার যে ইচ্ছে জেগেছিল তা যথাসাধ্য মিটিয়েছিলাম। কোনো বই পড়ে জেগে থাকিনি। আমার টেবিলে সব সময় অন্তত দশ-পনেরোটি বই না থাকলে টেবিল খুব খাল খালি লাগে। সেদিনও টেবিল পূর্ণ ছিল। একটির পর একটি বই হাতে তুলে নিয়ে যতই পাঠের চেষ্টা করছিলাম ততই মন অন্য কিছু চাইছিল। আর আমি চিরকালই মনের অনুগত ভৃত্যের ভূমিকাটি পালন করে এসেছি। সেদিনও সেই দায়িত্বে আন্তরিক ছিলাম। সেদিন এক বই থেকে অন্য বইতে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত অভি-ধান টেনে নিয়েছিলাম। কে এখনও বলে বাংলায় শব্দের কোষাগারে তত অর্থ নেই। তাকে অজ্ঞ বলার প্রকৃত সময় এসে গেছে। আমি 'অক্ষি'র পাশে 'অখণ্ড'কে পাচ্ছি। 'অক্সিজেন' থেকে চলে যেতে পারছি 'কল্লান্ত'তে। 'নির্বর্ষ'—এই শব্দটির পরে 'স্নাতকোত্তর'কে পেতে তেমন কোনো বিলম্ব হয় না। সেই পেয়ে পেয়ে যাবার অলিন্দে দাঁড়িয়ে আমি পেলাম 'মঞ্জিমা'। মানে, শোভা, সৌন্দর্য, মনোজ্ঞতা। আমি অপর্ণাকে গানে ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়ে এসেছি। সে যখন গানের মধ্যে ছিল, কিংবা আমি তাদের বাড়ি প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম তখন বাক্স থেকে যেটিকে বের করে আনা হয়েছে, যার ওপর বহুদিন মাসিমার আঙুল পড়েছে, তা আর যাই হোক আজ আর শোভন, সুন্দর এবং মনোজ্ঞ নেই। কখনও কখনও পাকেচক্রে কানেও ভেসে এসেছে অপর্ণার গুঞ্জন—হারমোনিয়ামটা একেবারে গেছে।

প্রতিগুঞ্জন মাসিমার—এ তো আর আজকের নয়। আমার বিয়ের আগের। এখন চট করে নতুন পাবি কোথায়? সবকিছুর কত দাম বেড়ে গেছে। সেদিন 'মঞ্জিমা' এই শব্দটি অভিধান থেকে উঠে এসে আমার হৃদয়ে জায়গা পায়। বিছানায় যাবার আগে লক্ষ করি মা দিদির চিঠি ভুল করে আমার টেবিলে রেখে চলে গেছেন। সন্ধ্যেবেলায় ব্যস্ততার মুখে যে চিঠি কোনোমতে শেষ করেছিলাম তা আর একবার পড়তে গিয়ে দিদি তার বাগানের উদীয়মান আতাগুলির সম্পর্কে কী পরিমাণ দুশ্চিন্তার মধ্যে

আছে বুঝতে পারলাম। বাদুড় এবং ব্যাপক বাদুড়েরা আতার ওপর নেমে আসে। তারা ঠিক ঠিক সন্ধান পায়। সেই সন্ধানীদের হাত থেকে আতা-রক্ষায় দিদি যাদের পরামর্শ নেবে তারা কি দিদিকে বলবে লোহার জাল দিয়ে গাছ-ঢেকে রাখো ? সে কেমন ব্যাপার ? বিছানায় যাবার আগে এই বিস্ময়ের হাত ধরে থাকতে চেয়েছি। আমার যে হলুদ জলপাত্রটি মা প্রতিদিন পূর্ণ করে রেখে যেতেন তার কাছে পৌঁছতে সেদিন যে দেরি হয়েছিল তার জন্য অতিরিক্ত তৃষ্ণাবোধ ছিল নিঃসন্দেহে।

আমার সার কথা অপর্ণাকে শোনানোর কয়েকদিন বাদে আমি এক-দিন অফিসে গিয়ে একটা সবুজ আর কয়েকটা সাদা রঙের কাগজে আমার স্বাক্ষর দিয়ে রাখি। তারপর একটি চিঠির মাধ্যমে অফিসকে যে অধিকার দিয়ে দিই তার মাধ্যমে অফিস আমার প্রতি মাসের বেতন থেকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা কেটে যেতে থাকবে যতদিন না ধার শোধ হয়। এই চিঠি আর কাগজপত্রের সমবেত শক্তিতে আমি কিছু টাকা পেতে পারি। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেবার চেষ্টা করি কোথায় গেলে প্রাপ্য টাকার সমপরিমাণ অর্থের দ্বারা সত্যিকারের ভালো জিনিস পাওয়া যাবে। প্রায় প্রত্যেকেই যে দোকানটিকে চিহ্নিত করে তা আমার অফিসের খুবই কাছে। দোকানটির পাশ দিয়ে এর আগে বহুবার গেছি। দেখেছি অন্তত চার-পাঁচজন কোলের ওপর যন্ত্রাংশ রেখে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এবার দোকানের মধ্যে যাবার প্রয়োজন হল। যাঁর হাতে অগ্রিম অর্থ দিয়ে এলাম তিনি হাঁপানির রুগী। দোকানে তিনি সকালের দিকে আর বসেন না। সন্ধ্যের পর তাঁকে দোকানে পাওয়া যায়। তখন চুপচাপ বসে আছেন, কাজকর্ম দেখছেন, বিক্রির টাকা নিচ্ছেন এমন কোনো প্রচলিত মুদ্রায় তাঁকে দেখার আশা ছাড়তে হবে। একটা কেমন টানের ভাব নিয়ে যে জিনিস নির্মিত হয়ে আসছে, যা বাইরের দিক থেকে সম্পূর্ণ, তিনি সেটাকে উবু হয়ে বসে পরীক্ষা করতে শুরু করেন। এই পরীক্ষাপর্বে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কে বলল অভিজ্ঞতা নয়। তাঁর নেড়ে দেখার ফলে, তাঁর আঙুলের অবাধে একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যাওয়ায় যে শব্দের সৃষ্টি হয় তা

কোনো কোনো পীতাম্বর নৈঃশব্দ্যের মতো অবগাহনক্ষম। আমি যেদিন সন্ধ্যের পর অফিস থেকে বেরিয়ে তাঁর নাম শুনে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তখন তিনি একটি সদ্যোজাগ্রৎ যন্ত্রের বুকের ওপর দিয়ে আঙুল নিয়ে গিয়ে যে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছিলেন তার কথা ভুলে যাবার মতো শক্তি আমার কোনোদিনও হবে বলে মনে হয় না। কাজ শেষ করে তিনি আমার কথা শুনলেন। তিনি শেষে জানতে চাইলেন যেগুলির বোধন হয়ে গেছে তারই কোনো একটা বেছে দিলে আমি নেব কিনা। আমার অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম এবং জানালাম পরের দিন থেকে কাজ শুরু করে কয়েকদিনের মধ্যে একটি নতুন যন্ত্র বানিয়ে দিলে আমি সন্তুষ্ট হতে পারব। যে হাসি পাঠ করা যায় না সহজে এমন কোনো হাসি আমার কথায় তিনি উপহার দিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করলেন। জিনিস নিয়ে যাবার যে দিন উল্লিখিত হল, যে সময়ের কথা উঠল তখন তাঁকে পাব না, তবে তার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ নেই, সবই সুসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে, এই কটি কথা পরপর বলতে গিয়ে তিনি যেভাবে কেশে উঠলেন তা দেখলে কষ্ট হয়, যুক্ত হয় চিন্তা। কষ্ট আর চিন্তার একটি সমানুপাত নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। নির্দিষ্ট দিনে কিন্তু গিয়ে দেখলাম তাঁর অনুপস্থিতিতে কিছু অসম্পূর্ণ হয়ে নেই। তিনি কর্মচারীদের আগের দিন রাতে সবকিছু দেখিয়ে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে তবে বাড়ি গেছেন। একটি পূর্বাপর কৃষ্ণ বাক্সের মধ্যে আমাকে দেখানোর পরে নামিয়ে দেওয়া হল যন্ত্রটিকে। কর্মচারীদের একজন, বলতে হল না ছুটে গিয়ে নিয়ে এল রিকশা। আমি বসলে আমার দু পায়ের মাঝখানে বাক্সটির জায়গা করা হল। আমি লক্ষ্যের দিকে যেতে যেতে চালককে কয়েকবার বলেছিলাম—ভাই, খুব সাবধান। আস্তে আস্তে দেখে দেখে চলো।

সেদিন ছিল শনিবারের দ্বিপ্রহর। এ বিশ্বাস দৃঢ় ছিল, যেখানে যাচ্ছি সেখানকার মানুষজন খাওয়াদাওয়ার কাজ সেরে তখনও ঘুমের মধ্যে চলে যেতে পারেনি। আমি তো দুপুরে গিয়ে গিয়ে দেখেছি খাওয়ার

ঠিক পরে এক-একজন কী ভাবে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। একজন তো খেয়ে উঠে ছাদে উঠে গিয়ে দড়িতে টাঙানো শাড়ি পুনর্বিন্যস্ত করে চুলছাড়া অবস্থায় ঝুঁকে পড়বে। আমি জানি তখন সে সবকিছু দেখতে দেখতে কোনো কিছুই শেষ পর্যন্ত দেখে উঠবে না। সে ভূমির দিকে সন্নত থেকে একসময় এত অন্যমনস্ক হয়ে যাবে যে তাকে না ডেকে যদি তার পেছনে সাধারণ পদশব্দ রাখা যায়, যদি সারা ছাদ ঘুরে ঘুরে কোথাও থেমে বসে পড়া যায়, সে টেরও পাবে না। আর একজন হয়তো খেয়ে উঠে খাঁচা তুলে এনে ঘরের মাঝখানে রাখবে। পাখির সামনে লাল লঙ্কা ধরে বাঁ হাতের লম্বা নখ দিয়ে ভিজে ছোলা ছিঁড়ে ফেলতে থাকবে। আর এই ধরা আর ছেঁড়াকে একসূত্রে গেঁথে রাখবে একটি সবুজ অন্যমনস্কতা।

রিকশা থেকে নামার আগেই চালকের হাতে টাকা দেবার কাজটা সেরে ফেলেছিলাম। লোকটি যন্ত্র তুলে নিয়ে আমার আগে আগে যাচ্ছিল। পেছনে থেকে তাকে পরিচালিত করতে গিয়ে অপর্ণাকে দেখলাম। অপর্ণা ছাদের প্রান্তে দাঁড়িয়ে একেবারে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল। চিৎকার করার অবকাশ ছিল ঠিকই। সে ইচ্ছে অনেক কষ্টে দমন করতে পেরেছিলাম। বলা বাহুল্য, চালক আমার আগেই দোতলায় উঠে গিয়ে ভার নামাতে পেরেছিল। আমি গিয়ে দেখলাম বিহঙ্গবৃত্তের সামনে শোণিমা উপবিষ্ট এবং শোণিমার সামনে যন্ত্র রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছে চালক।—কী ব্যাপার, নালীকদা? কী এসব?

—মাসিমা কোথায়? একটু ডেকে দেবে?

পাশের ঘর থেকে শোণিমার সঙ্গে মাসিমা এলেন। মনে হচ্ছিল তাঁর মুখ কিছুটা তন্দ্রাজড়িত হতে যাবে এমন সময় উঠে এসেছেন। যে কাপড় পরে আছেন সেই কাপড়ের কোণ দিয়ে মুখ মুছে হেসে ওঠার চেষ্টা ছিল।

—এসব কী নালীক?

সামনে, আমাদের প্রত্যেকের সামনে যে কালো রঙের বাক্সটি স্থিতিলাভ করেছিল তার ডালা খুলে দিলাম:—মাসিমা, কিছু মনে

করবেন না। অপুর বিয়েতে আমার উপহার। আমি সন্ধ্যের দিকে আসব। শুধু একটু লক্ষ্য রাখবেন তার আগে হারমোনিয়ামে যেন হাত না পড়ে। এ কথাটা কেন যে বললাম তা তখন বুঝতে পারবেন।

সেদিন দুপুরে আমি আর এক মুহূর্ত দাঁড়াইনি। রিকশা করে হারমোনিয়াম আনার সময় থেকে একটি ভাবনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমি মনেপ্রাণে ভেবেছিলাম অপর্ণা হারমোনিয়ামে হাত দেবার আগে এই যন্ত্রের উদ্বোধন হবার প্রয়োজন আছে। এ কথা কাউকে বলতে চাইনি। শুধু সন্ধ্যে পর্যন্ত যে-অপেক্ষা তা ছিল আশাবাদীর উপবেশন। সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুরু দুরু বক্ষে বাদ্যযন্ত্রের দোকানের কাছে গিয়ে কী বলব আরও একবার তা ভেবে নিলাম। ওই তো তিনি যাকে খুঁজছি, যিনি উবু হয়ে নির্মিত যন্ত্রে আঙুল রেখে বোধনের পথ করে দিচ্ছেন।

—আপনার কাছে আবার এলাম।

তিনি যন্ত্র থেকে মুখ ওপরে তুললেন।—কী ব্যাপার? কোনো গণ্ডগোল হয়েছে?

—না, মানে আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে।

—বলুন না, থামলেন কেন?

—আমি যে বাড়িতে হারমোনিয়াম দিয়ে এসেছি সে বাড়িটা খুব কাছে। রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। আপনাকে কয়েক মিনিটের জন্য দয়া করে আমার সঙ্গে যেতে হবে। একটু বাদে আমি নিজেই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব। যাবেন তো?

—কী হয়েছে ঠিক করে বলুন তো? আমাকে নিয়ে যেতে চাইছেন কেন?

—আপনি গিয়ে দু মিনিট বাজিয়ে হারমোনিয়ামটার উদ্বোধন করে দেবেন।

—অদ্ভুত কথা বললেন। আমাকে আজ পর্যন্ত এমন কথা কেউ বলেনি।

—আপনি দয়া করে আপত্তি করবেন না। এটা আমার খুবই ব্যক্তি-গত একটা ইচ্ছে।

তিনি আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। রিকশায় সারাটা পথ তাঁকে নিঃশব্দ দেখেছিলাম। কোলের ওপর হাত ছুটি জড়ো করে তিনি এমনভাবে বসে-ছিলেন, এমনভাবে ঠোঁট নাড়ছিলেন যে মনে হচ্ছিল তিনি বোধ হয় প্রার্থনার মতো কোনো ছুরূহ কাজে আত্মমগ্ন আছেন।

সুজনদা শহরে ছিল না। তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়েছিলাম আমরা চারজন—মাসিমা, অপর্ণা, শোণিমা এবং আমি। তাঁর সামনে আবরণমুক্ত হারমোনিয়াম। তিনি সেদিন অনায়াসে শব্দ করতে করতে খুলে দিয়েছিলন কয়েকটি মনোদরজা। কিংবা বলা যায় অপর্ণার প্রতি আমার যে মন তাকে তিনি সুরের অবলম্বন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। তাঁর আঙুল যখন থামল কাউকে কিছু বলতে হল না, কেউ বাধাও দিতে পারল না। অপর্ণা উঠে এসে তাঁকে প্রণাম করল। সেই সন্ধ্যেরাতে তিনি এই প্রণাম নিতে গিয়ে হাতজোড় করে কেঁদে ফেলেছিলেন।

এই সন্ধ্যেরাতের কান্নার পর থেকে অপর্ণাদের বাড়িতে যাওয়া আমার নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে যায়। আমি গিয়ে প্রথমে জেনে নিই অপর্ণা ভোরে উঠে ছাদের ঘরে গিয়ে রেওয়াজ করেছে কিনা। এমন খুব কম দিনই পেয়েছি যখন শুনতে হয়েছে—না, আজ ও ভোরে উঠতে পারেনি। শরীর খারাপ ছিল। কোনো কোনো দিন এমন হয়েছে সন্ধ্যের দিকে সে আমাকে নীচে বসিয়ে রেখে ছাদে রেওয়াজ করতে চলে গেছে। আমি হয়তো শোণিমার সঙ্গে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলে কোনো কাজে বেরিয়ে পড়েছি। অপেক্ষা করাটাকে মনে হয়েছে অতিরিক্ত কিছু। অন্তত ছুদিন এইভাবে বেরিয়ে পড়ে লক্ষ্য করলাম অপর্ণাদের বাড়ির কাজের মেয়েটি তাদের বস্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় আমাকে দেখে একটু সচে-তন হয়ে কী সব নীচু স্বরে বলে যাচ্ছে। তার শ্রোতাদের মধ্যে আমি যে মেয়েটিকে চিনতে পারলাম সে তখন কিছুদিন হল আমাদের বাড়িতে বাসন মাজছে, কয়লা ভাঙছে, ঘর মুছে দিচ্ছে এবং খাবার জল নিয়ে

আসছে। পিসিমার মৃত্যুর কিছুদিন বাদে শোভা কাজ ছেড়ে দেবার পর থেকে বহু মেয়েকে আমাদের বাড়িতে আসতে এবং যেতে দেখা গেছে। এমন মেয়েও এসেছে যে ঠিক তিনদিন কাজ করে তার পাওনা বুঝে নিয়ে চলে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। এই অস্থিরতার কোনো কোনো পর্ব খুবই কষ্টের ছিল। মাকে তাঁর দুর্বল শরীর নিয়ে এমন সব কাজ করতে হত যা করাটা তাঁর পক্ষে শুধু ক্ষতিকারক নয়, অশোভনও। মা কয়লাঘর থেকে বেরিয়ে হাত-পা ধুয়ে ঠাকুরঘরে গেলে আমার অন্তত মনে হত মাকে সবই করে যেতে হচ্ছে করে যাওয়া দরকার বলে। করার আনন্দে যা করে ওঠা যায় তেমন কোনো কাজ মার প্রায় নেই। তখনই অপর্ণাদের সীতার দ্বারা মা গীতাকে পেয়ে যান। আমাদের খাদ্যতালিকার প্রতিটি খাদ্য গীতা যাতে দুপুরে পেতে পারে মা তার জন্য সচেষ্ট থাকেন এবং প্রায়ই সার্থক হয়ে যান। গীতা সারাদিন আমাদের বাড়িতে থেকে সূর্যাস্তের পর বস্তির পথ ধরত। বাড়িতে কোনো আত্মীয়সমাগম হলে বা কোনো উৎসবের বাতাস বয়ে গেলে এমনও হয়েছে সন্ধ্যের অনেক পরে তার রাতের খাওয়া সেরে সুপুরি মুখে দিয়ে গীতা বাড়ি ফিরে গেছে। ফুটফুটে বিকেলগুলোতে আমাদের বারান্দায় মা তাকে নিয়ে বসতেন। মা তাঁর চুল ছেড়ে দিতেন। সেই খোলা চুলকে পরিষ্কার করে একটি রূপে আবদ্ধ করার দায়িত্ব নিত গীতা। মায়ের পেছনে বসে কাজ করতে করতে মায়ের পেছনের দিন-গুলির অনেক কথাই ক্লান্ত না হয়ে শুনে যাবার ক্ষমতা তার ছিল। মাও শুনতেন অসীম ধৈর্য নিয়ে তার সামনে বসে তার সামনের দিনগুলিকে নিয়ে তার যত জল্পনা-কল্পনা। একজনের অতীত এবং অন্যজনের ভবিষ্যৎ-চর্চার মাঝখানে একজনের ভবিষ্যৎ এবং অন্যজনের অতীত এসে পড়ত এবং সেই সমাগমের আলোয় বর্তমানের যে মুখটি ফুটে উঠত তা তুচ্ছ করার মতো মনোবল কোনো পক্ষেরই ছিল না। ফলে আমি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে মাঝে মাঝে বুঝতে পারছিলাম মার পেছনে এবং গীতার সামনে যে নীরবতার বিরাজ ঘটছে তা বড়ো বানানো এবং তা বড়ো আকস্মিক। আর সীতা মার সঙ্গে গীতার পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্য

যেদিন বিকেলে এসে বারান্দায় বসে অপেক্ষা করেছিল সেদিনের পর বহু-দিন ধরে তাকে আমি আমাদের বাড়িতে দেখতে পাইনি। কিন্তু বস্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে তার সেই চাপাস্বরে কথা বলার পরে খুব একটা দেরি হয় না, তাকে একদিন আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় সন্তর্পণে।

সে বছর বাংলা মতে আমার জন্ম তারিখ ছিল না। সে বছর আমার জন্মমাসটি বত্রিশ দিনের বদলে একত্রিশ দিনে শেষ হয়ে ছিল। তবু ইংরেজি তারিখটিকে সম্বল করে একটি পার্বণের স্বাদ এর আগেও কয়েক-বার আনা হয়েছে। এইসব দিনগুলিতে আমার দিক থেকে সাধারণত মা-বাবার পদস্পর্শ করার একটা প্রেরণা থাকে এবং মা-বাবার দিক থেকে আমার মস্তকস্পর্শের দায়িত্ব থেকে যায়। এইসব দিনগুলিতে আমি যখন বাবার পদস্পর্শ করার জন্য আমাদের সবচেয়ে বড়ো ঘরটিতে প্রবেশ করি, বাবা জানলার পাশের চেয়ারে একটু আগে নিক্ষিপ্ত খবরের কাগজ মেলে ধরে বসে থাকেন। তাঁর ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত থাকে। তিনি যৌবনে বহু দূরের অনাবৃত ঊর্ধ্বের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতেন। তাঁর চার দিকে বিরাজ করত অদ্রি, বনানী ও নদীর সব স্বেচ্ছাচার। সেই তাকিয়ে থাকার কোনো শেষ থাকত না এক-একদিন। এক-এক-দিন তাকিয়ে থাকার আগেই শর্বরীকে দিবালোকিত করে দিত ওপর থেকে নেমে আসা বিমানের আলো এবং আলোর সূত্র ধরে শুরু হত শব্দের প্রলয়। প্রলয়ের শেষে বড়ো কোনো বিবরের মধ্য থেকে উঠে এসে তাঁর সজল চোখ এক এক করে আবিষ্কার করত বন্ধুদের মৃতদেহ। শায়িত বন্ধুদের ফেলে রেখে তাঁকে বহুবার এগিয়ে যেতে হয়েছে। এক-বার আছন্ন অন্ধকারে তিনি এক পারাপারের নৌকোতে পা রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি যাবার আগেই নৌকো তাঁর কিছু সতীর্থের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি নৌকোতে উঠতে গেলে মাঝি রাজি হতে গিয়েও কী ভেবে পিছিয়ে যায়। তাঁকে নৌকোর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়। সে নৌকো আর ফেরেনি। মাঝ-নদীতে বাবার

চোখের সামনে তার জলসমাধি ঘটে। বাবা সেদিন ওই নৌকোয় পা রাখলে আমি জন্মদিনের সকালে খোলা জানলার পাশে পাঠরত বাবার পায়ে হাত রাখতে পারতাম না। প্রতিবার বাবা পায়ে হাত রাখলে আমার মাথায় হাত রেখে জয়ধ্বনি দিতেন। অন্তত তিরিশ সেকেণ্ডের জন্য আমাকে আলিঙ্গন করতেন। আলিঙ্গনের পর দিনের কোনো এক সময়ে তাঁকে আমি যেভাবেই হোক পুরনো দিনের ঝাঁপির সামনে এনে দাঁড় করাতাম। আর তিনি গতিময় সাপুড়ের সমস্ত গুণ নিয়ে ঝাঁপির ঢাকা খুলে বের করে আনতেন এক-একটি নাগমুহূর্ত। তিনি দক্ষিণের জমির কথা বলতেন। যুদ্ধের শেষে দেশে ফিরে তিনি বুঝলেন দেশ ছাড়তে হবে। ছাড়তে হবে দক্ষিণের সব উর্বর মৃত্তিকা। বড় শহরের পথে দেখা হল পিটারের সঙ্গে। সেই দীর্ঘদেহী তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে জেনেছিলেন। পিটার তাঁকে ডেকে নিয়ে বসিয়ে দিলেন এমন এক অফিসে যেখানে দুর্গম সব নদীর সেতুবন্ধন নিয়ে রাতদিন কাজ চলছে। বাবা আমাকে বলেছিলেন কত আশা নিয়ে তাঁর অফিসে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে মাটিতে বুক ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিল এক স্বপ্নচারী নমঃশূদ্র। যে জমি ছেড়ে চলে আসতে হবে সেই জমির বিনিময়ে সে তাঁকে দিতে চেয়েছিল অর্থের একটি উজ্জ্বল অঙ্ক। কিন্তু বাবা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন অন্তত শেষ মুহূর্তে এমন কোনো ঘণ্টা বেজে উঠবে যা ছুটির ঘণ্টা নয়, যা দক্ষিণের জমি নিয়ে বেঁচে থাকার ঘণ্টা। "সেই টাকা যদি তখন নিয়ে নিতাম আজ কত কিছু হয়ে যেত"—এই অনুতাপের বাক্যটি তুলে রেখে বাবা ঝাঁপির মুখ বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু বত্রিশ দিনের বদলে একত্রিশ দিনে শেষ হওয়া সেই জন্মমাসের বছরে ইংরেজি তারিখের সূত্র ধরে আমি সবচেয়ে বড়ো ঘরে গিয়ে সকালের খোলা জানলার পাশে পাঠরত বাবাকে পেলাম না। তাঁকে পেলাম সবচেয়ে ছোটো ঘরের খাটে শায়িত অবস্থায়। তাঁকে ডেকে তুলে তাঁর পদস্পর্শ করলে তিনি আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন ঠিকই। কিন্তু কোনো আলিঙ্গন ছিল না এবং জয়ধ্বনির বদলে উচ্চারিত হল, 'ঈশ্বর তোমাকে শুভবুদ্ধি দিন।'

জন্মদিনের সকালে মার পায়ে হাত রাখার জন্য আমি যে-ঘরটিতে চলে যেতাম সেখানে একদিকে সিংহাসন এবং অন্যদিকে অগ্নিপরিধি। মা উনুনে কিছু বসিয়ে দিয়ে সিংহাসনের সামনে গিয়ে বসে পড়তেন। হাতে ভিজে কাপড় নিয়ে সিংহাসন থেকে তুলে এনে তিনি পাথর কাঁচ ও কাঠের নানা আঙ্গিক পরিমার্জিত করে যেতেন। পরিমার্জনার পর চন্দন বানিয়ে নিয়ে অনুলেপনের কাজ করতে করতে তাঁকে আবার অগ্নিক্ষেত্রে ফিরে যেতে হত। এই ফিরে-যাওয়া এবং ফিরে-আসার মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসত ধূপের গন্ধ, সিংহাসনজোড়া স্নিগ্ধতা, নানা মরসুমি সবজির সিদ্ধি ও হলুদে ডোবা মীনপুচ্ছ। পারাপারের মাঝখানে মাকে আমি ধরে ফেলতাম ঠিক। পদস্পর্শ করে মাথা তোলার সঙ্গে সঙ্গে আমার চিবুক ছুঁয়ে মা আমার মাথায় রাখতেন কৌটো থেকে তুলে আনা ধান। যখন ভাত খেতে বসতাম তিনি ভাতের থালার পাশে যে বাটি রেখে খাওয়া শুরু করার আগে তার থেকে অনুপরিমাণ কিছু তুলে নিয়ে উদ্বোধন করার কথা বলতেন তা ধারণ করত ঘনীভূত পায়েস। আমার উদ্বোধন করার কাজ না দেখে মা স্থানত্যাগ করতেন না। কিন্তু তাঁকেও ছেড়ে আসতে হয়েছিল পায়েস-প্রমাণ শুভ্রতাব মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক-একটি অন্দর, তাঁর পিতাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ঘরে নিয়ে আসার মতো শক্তি, পায়ে আলতা পরে জলটুঙি ছুঁয়ে আসার মতো অবাধ্যতা। মধ্যযৌবনে মুছে যাওয়া তাঁর পিতার কপালের ভাঁজ তিনি আমার কপালে খুঁজে পেয়ে একই সঙ্গে শঙ্কিত ও সানন্দ হতেন। জন্মদিনের সকালে আমার মাথায় তাঁর অবারিত হাত সেই শঙ্কা ও আনন্দের একটি সমবায় হয়ে ফুটে উঠত। সেদিন যখন আমি নত হয়ে পায়ে হাত রাখতে গেলাম তিনি পাকে বিচলিত করে বাধার সৃষ্টি করলেন এবং প্রণাম শেষ হবার আগেই তিনি আমার মাথায় হাত রাখতে চেয়েছিলেন সবিস্তারে। এক হাতের বদলে দু হাত মাথায় রেখে মা বলতে পেরেছিলেন—মাগো, একে ডাইনির হাত থেকে বাঁচাও। রক্ষা করো, রক্ষা করো।

বহুদিন আগে এক রাতে একটা অদ্ভুত শব্দে আমরা সবাই জেগে উঠি। সবার আগে জেগে গিয়েছিলেন পিসিমা। তিনি তাঁর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে উঠোন থেকে উঠে-আসা শব্দের কারণ জানতে গিয়ে এমন কিছু দেখতে পান যাতে তাঁর মতো সাহসীরও প্রতিবন্ধকতা আসে। তিনি আর দরজা খুলে বেরিয়ে না এসে জানলার সামনে থেকেই চিৎকার করতে থাকেন—নিবারণ, ও নিবারণ, শীগগির ওঠ। উঠে ত্যাখ এ আবার কোন আপদ। বাবার দুপাশে আমি আর বুবুন ছিলাম। মা সে খাটে ছিলেন না। সরু একফালি কাঠকে কিভাবে যেন প্রায় খাট করে একজনের উপযুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। মা সেই ক্ষেত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তেন। পিসিমার ডাকে শুধু তো বাবা নয়, আমরা সবাই জেগে উঠেছিলাম। তখনই শুনতে পেলাম আমাদের লম্বা এবং সরু বারান্দা জুড়ে, আমাদের ছোট্ট উঠোন জুড়ে কিছু একটা উড়তে না পারার শব্দ করছে। মনে আছে, শব্দের মধ্যে অবিশ্রাম অস্থিরতা ছিল। বাবা দরজা খুলে ছুটে বারান্দায় চলে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু এতে মার তীব্র আপত্তি ছিল। তিনি চেয়েছিলেন বাবা প্রথমে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু বুঝে নিয়ে তারপর দরজা খুলুন। বাবা বিরক্ত হয়ে জানলার সামনে গেলে আমিও খাট থেকে নেমে পড়ি। বুঝতে একটু সময় লেগেছিল যে, যে-বিরাট খেচর বারান্দা থেকে উঠোনে এবং উঠোন থেকে বারান্দায় হেঁটে হেঁটে মাঝে মাঝে উড়ে যাবার চেষ্টা করে প্রসারণজনিত সমস্যায় ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সে একটা শকুন। অদূরবর্তী যে গঙ্গা তার ওপরের সেতুর চূড়া থেকে অথবা সামনের দুটি নারকেলগাছের উচ্চতম অবস্থান থেকে সে ভুল করে ঝরে পড়েছিল। বাবার জানলার দিকে এবং পিসিমার জানলার দিকে সে এত বিচলিত হয়ে ছুটে আসছিল যে মনে না হয়ে পারেনি সে আক্রমণোদ্যত। আর শকুনকে যখন তেড়ে আসতে দেখা যায় তখন যে ভয়ের জন্ম হয় সেই ভয় বাবার মধ্যেও ছড়িয়ে যাচ্ছিল। বাবা তক্ষুনি দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ার কথা আর না ভেবে ঘরের ভেতর থেকে একটা লম্বা লাঠির মুখ বাইরে রেখে ভয় দেখানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এক-

দিকে ডানা ঠিকমতো মেলে দিয়ে উড়ে চলে যাবার চেষ্টা, অন্যদিকে লাঠি ঠুকে ঠুকে প্রতিরোধ করে যাবার চেষ্টা বহুক্ষণ ধরে চলেছিল। এক সময় সফলতা এল অকস্মাৎ। আমরা সবাই দেখলাম সেই কৃষ্ণ এবং বিরাট অস্থিরতা উর্ধ্বের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। ভোরের আলোয় পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল খেচর হয়ে পড়েছিল কতটা ভয়াচ্ছন্ন। উঠোনে এবং বারান্দায় প্রচুরভাবে পড়ে থাকা মলমূত্রকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনি। বলা যায় ইংরেজি সূত্র ধরে এসে পড়া আমার সেই জন্মদিন থেকে শুরু হল বিপন্নতার সঙ্গে বিপন্নতার যুদ্ধ।

অসময়ে ছাদের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপর্ণা যেদিন বোঝাল— আমার খুব ভয় করছে, তুমি এবার একটা কিছু করো—আমি তার পরের দিন দুজন মানুষকে মা-বাবার কাছে যাবার জন্য উদ্দীপিত করি। একজন অংশুময়। আমার সমাধ্যায়ী। আমি যে ছোটো কাগজটি বহুদিন ধরে বের করে আসছি তার বড়ো স্তম্ভ। তার অধ্যাপক পিতাকে আমি বহুদিন মোমের শিখার সামনে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তিনিই প্রথম আমাকে তাঁর একতলার প্রায়ান্ধকার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—একটা কথা তোমাকে বলি। ইচ্ছেশক্তি একটা খুব বড়ো ব্যাপার। একজন সেই শক্তির সাহায্যে পাহাড়কেও নড়িয়ে দিতে পারে। —তিনি মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিতেন—নালীক, কী বলেছিলাম মনে আছে তো ? তাড়াহুড়োর কী দরকার, সব সময়ে খুব সাবধানে রাস্তা পার হবে। আর কখনও মুখে-মুখে আঁক কষবে না। অঙ্ক করবে কর গুনে গুনে।—তাঁকে দেখেছি রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে। এদিক ওদিক দুদিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নিতেন। দূরে কোথাও গাড়ির চিহ্ন দেখতে পেলে তিনি পার হবার জন্য এগিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিতেন। যতক্ষণ না সেটি দৃষ্টিপথ থেকে মুছে যায় তিনি ততক্ষণ পথে দাঁড়িয়ে থাকতেন অনির্বাণ মগ্নতা নিয়ে। আমাদের ছোটো পত্রিকাটি বের হলে অংশুময় যে যে জায়গায় পত্রিকা পাঠানো দরকার সেইসব অজস্র ঠিকানা নিয়ে সারা বিকেল ধরে একটি আচ্ছন্ন অবস্থায় বাস করে। প্রথমে ছোটো

পত্রিকার বড়ো বড়ো ভুলগুলিকে সে ঝরনা-কলম দিয়ে সংশোধিত করে দেয়। তারপর এক এক করে ঠিকানা লেখে ছাপানো খামের ওপর। প্রতিটি খামের মধ্যে প্রতিটি পত্রিকা ঢুকিয়ে দিয়ে সে যখন ধূমপান করে তখন অস্তাচলগামী দিনেশের ব্যাপ্তি-কণিকা থেকে তাকে পৃথক করে নেবার সুযোগ খুব কমই থাকে। এমন এক মহামিশ্রণক্ষণে আমি তার কাছে নিজেকে উন্মোচিত করি। তাকে রাজি করাতে কোনোরকম কষ্ট পোহাতে হয় না।

আমার দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন যথার্থ স্মৃতিভাণ্ডারী। তাঁকে দিয়ে প্রতি সংখ্যায় আমাদের পত্রিকায় লেখাতে পেরে আমরা গর্বিত থাকার সুযোগ পেয়ে গেছি। তিনি তাঁর রচিত এবং পঠিত গ্রন্থ থেকে সরে গিয়ে মাঝে মাঝে নির্‌গ্রন্থ হয়ে যাবার ভাবনা পোষণ করেন। তাঁর কাছ থেকে যেসব লেখক একসময় বহুভাবে উপকৃত হয়েছেন তাঁর কয়েকশো গল্পের মধ্যে তাঁরা কখনও ভুলেও এসে পড়েন না। তিনি ভোরের দিকে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েন তাঁরই এক উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের মতো। বাজারে যাবার আগে কখনও চলে যান লম্বা জলফালির দিকে। কখনও গঙ্গার পাড়ে দ্বাদশ শিবমন্দিরের ধবলতম চূড়ার দিকে। কখনও তেমন কোনোদিকে নয়, এদিকে-ওদিকে যেখানে সেখানে। যে দিন আমার কাছে এসে পড়েন আমি হয়তো তখন বিছানা ছাড়ার আগে শেষবারের মতো তাকে আঁকড়ে ধরেছি। 'নালীক, নালীক'—এই ডাক তমোভাব নষ্ট করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে থাকে। উঠে এসে আমি হয়তো বলি—আসুন উপানন্দদা, ভেতরে আসুন। তিনি কোনো একটা যোগ্য কারণ দেখিয়ে ভেতরে এসে বসার মতো সময়ের যে অভাব আছে তা জানান। আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাড়ির গলির মাথায় দাঁড়িয়ে তাঁর অনেক ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেন। যেমন তাঁর সংগ্রহ থেকে এনে পড়ে ফেলা তাঁর অনেক প্রিয় বই তিনি আমাকে চিরতরে দিয়ে দিতে চান। 'চিরতরে'—শব্দটিকে তিনি এত স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেন যে ফুটে উঠতে থাকে কোনো এক রঙ যা ঠিক গোধূলির সমধর্মী।

আমার উৎসাহ জাগে। আমি হয়তো কী কী বই পাওয়া যেতে পারে তার তালিকা শুনতে চাই। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জন্মগ্রহণ করেছেন এমন কোনো আত্মদীপ্ত সংস্কারকের নিজের লেখা জীবনীর কথা তিনি আমাকে বলেন। বইটি ওঁর কাছ থেকে নিয়ে এসে এর আগে যখন পড়ি তখন নানা কারণে বিমুগ্ধ করেছিল। লেখক ছিয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে বহু ক্ষেত্রে পৌঁছে যেতেন। তাঁর বাড়িতে কয়েকজন ক্রীত-দাসদাসী ছিল। বারো টাকায় একজন দাসীকে তার দুই ছেলে এবং এক মেয়ে সমেত কিনে নেওয়া হয়। আর পুজোর সময় মহিষের বিক্রমের বর্ণনা আছে। তার চার পায়ে দড়ি বাঁধা হয়েছিল। দড়ি বাঁধা হয়েছিল তার গলায়। তার ঘাড় কলা দিয়ে মর্দন করা হয়েছিল। অনিচ্ছুক মহিষকে সমবেত সবাই ধরে নিয়ে হাড়িকাঠে আটকে দিয়েছিল তার গলা। কিন্তু সে প্রচণ্ড বিক্রমে এক সময়ে হাড়িকাঠসহ দাঁড়িয়ে পড়েছিল। উপানন্দদা যেদিন ভোরে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তাঁর বাঁয়া আর তবলা চিরতরে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সেদিন তাঁকে রাজি করাতে আমার কোনোরকম কষ্ট হয়নি। কারণ ভোরবেলার আত্মোন্মোচন আর যাই হোক দুর্বল হয় না।

অংশুময় যখন মা-বাবার কাছে গিয়েছিল তখন উপানন্দদা যাননি, এবং উপানন্দদা যখন গিয়েছিলেন তখন অংশুময়ের দৌত্য শেষ হয়ে গেছে। দুজনকেই ভারী মন নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। দুজনের কেউই তাঁদের বোঝাতে পারেনি যে ফল উচ্ছিষ্ট হতে পারে, কিন্তু মানুষ কখনও উচ্ছিষ্ট হতে পারে না। এই ব্যর্থতার ঠিক পরে আমি কিছু কিছু কাজ সেরে ফেলার জন্য শান্ত থাকার চেষ্টা করি। একদিন মধ্যাহ্নে এক মধ্যবয়স্ক পুরুষকে অধিক অর্থের বিনিময়ে অপর্ণাদের বাড়িতে নিয়ে আসা হলে তিনি আইনের শক্তিতে আমাদের দুজনের হাত মিলিয়ে দিয়ে যান কয়েক মিনিটের মধ্যে। একদিন আবিষ্কার করি বাড়ি থেকে কয়েক মিনিট দূরে নতুন স্টেশন হয়েছে। গভীর রাতে যে গাড়ি শিস দিতে দিতে একটি অলৌকিক প্রভাব রেখে রেখে চলে যেত সে এবার

থেকে বাড়ির কাছে থামছে। সেই থেমে যাবার সুযোগ নিয়ে আমি কয়েক স্টেশন ছাড়িয়ে একটি বাড়িও দেখে এলাম কাউকে কিছু না জানিয়ে। একেবারে নতুন বাড়ি। ভাত খেয়ে উঠে সুপুরি মুখে নিয়েও আসন্ন ট্রেন ধরে ফেলা যায়। এমনই নৈকট্য যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল অপর্ণা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েও দেখতে পাবে আমি ট্রেনে উঠছি এবং তেমন প্রয়োজন হলে সে রুমাল নাড়াতেও পারবে। বাড়িটার ঘেরা বারান্দায় ঘরের বিস্তৃতি আছে। কিন্তু জলের বন্দোবস্ত তখনও হয়নি, আলোর বন্দোবস্ত হয়েছে। বাড়ির মালিক তরুণ। অফিস থেকে ধার নিয়ে বাড়ি করেছেন। তাড়াতাড়ি জলের বন্দোবস্ত করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অপর্ণাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিলাম। সে খুব খুশি। শোণিমাকে বললাম—চলো দেখে আসবে। সে ঠিক রাজি হল না।—তোমরা থাকবে, তোমাদের পছন্দ হওয়াটাই বড়ো কথা। আমি পরে যাব। তোমরা গুছিয়ে বসো, তারপর এত যেতে থাকব যে বিরক্ত হবে।—এক রোববার বিকেলে গিয়ে তরুণ মালিকের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি সহাস্য হলেন।—আপনারা আসবেন, এদিকে জল নেই। আমি তো বেশ চিন্তায় পড়েছিলাম। যাক সে সমস্যা মিটিয়েছি। এবার চলে আসতে পারেন। সদ্যঃখনিত পাতকুয়োর মুখ ঢাকা ছিল। সেদিকে একবার গিয়ে ঘুরে এলাম। বাড়ি ফিরে ঠিক করলাম তার পরের দিন থেকে কিছু কিছু বই, কিছু কিছু জিনিস, কিছু কিছু কিনে কিছু সংগ্রহ করে নতুন বাড়িতে রেখে আসব। এই চলে যাবার কথা রাতের থমকে-যাওয়া আবহাওয়ায় ঘুরে ঘুরে আমাকে অত্যন্ত খালি করে দিয়ে যাচ্ছিল। আমি আলমারি খুলে তাক থেকে বই নামাতে শুরু করে দিলাম। আমার ভাত ঢাকা থাকত। প্রতিদিন বাড়ি ফিরলে সাধারণত বুবুন দরজা খুলে দিয়ে চলে যেত। তাকে আর আমার আশেপাশে কোথাও দেখতে পেতাম না। সে নিশ্চয়ই সেই অন্ধকার ঘরটিতে চলে যেত যেখানে তার বহু আগে বাবা মা গিয়ে বসে বা শুয়ে থাকতেন এবং আমি আসার পর থেকে কোনো রকম শব্দ শোনা যেত না। সেদিন বই নামাচ্ছি আর অনেক বই নামানো

হয়ে গেছে সশব্দে। 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'ছিন্নপত্র', 'মহাকাশ পরিচয়', 'যাদু-কাহিনী' সব একাকার হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। একটু আগে দেখে এসেছি অপর্ণাদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত অখণ্ড এবং মণ্ডলাকার নক্ষত্র-ব্যাপ্তি। একটু আগে শুনতে পেয়েছি প্রতিবেশীদের দরজা বন্ধ হয়ে যাবার নানা আওয়াজ। আমার পেছনে অনেক পদশব্দ পেলাম। তাকিয়ে দেখি অন্ধকার ঘর থেকে গ্রন্থের ঘরে একে একে উপস্থিত বাবা-মা-বুবুন। মা আমার নামানো বইগুলির পাশে বসে পড়লেন। বুবুন ঘরের একেবারে শেষদিকের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর বাবা? বহু যুগ আগের রাত্রিতে বিমান থেকে বানিয়ে তোলা দিবালোকে শব্দের প্রলয় ঘটে যাবার পর বড়ো বিবর থেকে নির্গত হয়ে মৃত বন্ধুদের সামনে যে জলময় চক্ষু রেখেছিলেন, আমি বিশ্বাস করি সে-রাতে বাবার মধ্যে তারই পুনরাবৃত্তি ছিল। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমার পিঠে হাত রাখলেন। হাতে আলিঙ্গন ছিল। আমি চাইছিলাম হাত আরো একটু উঠে গিয়ে আমার মস্তক স্পর্শ করুক। তখনই তিনি উচ্চারণ করে উঠলেন—কোথায় যাবে তুমি? আমরা তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।—তাঁর উচ্চারণে আমি এই প্রথম দেবনাগরীর স্পর্শ পেলাম। ফলে পিসিমার এই ঘরে আমার অপরিহার্যতার সূত্রে অপর্ণা চলে এল কৃষ্ণাপঞ্চমীতে।

রাত কত হল জানি না। টেবিলের ওপর বিয়েতে পাওয়া ঘড়ি আছে। বিছানায় দেহ সঙ্কুচিত করে দেয়ালের দিকে যে তাকিয়ে থাকে তার কাছে টেবিল খুব একটা কাছের ব্যাপার নয়। এবার কিন্তু তাবৎ মানবিক সম্পর্কের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া গালাগালির আওয়াজ বেশ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। তার মানে রাতের মধ্যে এসে পড়েছে যথেষ্ট বয়স। কেউ কোথাও যখন আর জেগে থাকে না তখনই তো পাগলী চিৎকার করতে বাধ্য হয়। এক মাস ধরে দেখছি আমাদের বাড়ির সামনের পথে এই চল্লিশোত্তর নারী চুল ছেড়ে দিয়ে সারা দিন সারা রাত

কাটিয়ে দিচ্ছে। কাদের বাড়ির বউ, কাদের বাড়ির মেয়ে, কোন বস্তির সম্পদ—এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। আমি যতবার তার পাশ দিয়ে গেছি তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি। সিঁথি সিঁদুরে আচ্ছন্ন করে পা ছড়িয়ে বসে থাকে। পিসিমাকে উপকথা বলার সময় এমনই নিরুদ্বিগ্ন দেখেছি। সে কী খায় তা নিয়ে ভাবি না। অন্তত তিন-চারটে বাড়ি আশেপাশে আছে যেগুলির ভিতর থেকে যুবতী আর বৃদ্ধারা বেরিয়ে এসে উচ্ছিষ্ট উপুড় করে দিয়ে যেতে পারে রোজ। আমি ভাবি তার সিঁদুর নিয়ে। আমি যখন অফিসে থাকি সে নাকি কোনো এক সময় তখন একবার করে রোজ উঠে এসে পথের কলে স্নান সেরে নেয়। তারপর তার আসনে ফিরে গিয়ে গভীরভাবে সিঁদুর পরে। এই কাজটি না করা পর্যন্ত তাকে প্রদত্ত সব উচ্ছিষ্ট সে হেলায় সরিয়ে রেখে দেয় এক পাশে। প্রতিদিনই পাশের বস্তির ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা তাকে বিরক্ত করার সুযোগ খোঁজে। তখন সে চিৎকার করে থাকে ঠিকই, তবে তা স্বল্পায়ু। কিন্তু তার এই শর্বরীশব্দ নিরবচ্ছিন্ন আর আয়ুষ্মান। প্রথমে ভেবেছিলাম রাতের কুকুরের সামনে আমাদের চোখে পড়ার মতো কোনো কিছু না থাকলেও সে যেমন ডেকে যায় এ-ও হয়তো তেমন কোনো রহস্যময় ডাক। এই ধারণা আমার কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত ছিল। কিন্তু কাল রাতে অপর্ণা আমার সে ধারণা ভেঙে দিয়েছে।—জান কাল কী হয়েছে?

—কী হয়েছে?

—মিতুনের মা বলছিল। ওদের বাড়ির জানলা দিয়ে সব দেখা যায়। কাল পাগলীটা অসম্ভব চিৎকার করছিল। মিতুনের মা জানলা খুলে দ্যাখে···এই পর্যন্ত বলে থেমে যাওয়ায় আমি অপর্ণার মুখের দিকে ভালোভাবে তাকালাম। সেখানে ঘন লজ্জা।

—কী হল, বলো!

—দ্যাখে একজন হাত ধরেছে, একজন পা ধরেছে। আর একজন যা করার তাই করে যাচ্ছে। শোনার পর থেকে আমার এত খারাপ লাগছে কী বলব।

চণ্ডীতে রাত্রিসূক্ত আছে। রাত্রিদেবীকে প্রসন্ন করার জন্য এমন সব কথা বলা হয়েছে যা আজও আমাকে স্পর্শ করে যায়। রাত্রিদেবী আসছেন। আসতে আসতে ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা অর্থাৎ নক্ষত্রের চোখ দিয়ে সমস্ত বিশ্ব তিনি দেখে যাচ্ছেন। মরণরহিত এবং নিত্য হয়ে তিনি বিস্তীর্ণ আকাশকে পরিব্যাপ্ত করছেন। ছোটো ছোটো লতাগুল্ম এবং উঁচু উঁচু বৃক্ষকেও তিনি ঢেকে দিচ্ছেন। প্রথম শয্যাসাক্ষাতে তিনি অপর্ণা এবং আমাকেও আবৃত করে দিয়েছিলেন। তাঁর অনুগ্রহের শেষ নেই।

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ॥

রাত্রিদেবীর দয়ায় গ্রামবাসীরা, গো-মহিষ প্রভৃতি পশুগণ, পক্ষিসমূহ, কামার্থিগণ এবং শ্যেন পাখিরাও সুখে শয়ন করে। শরীরেরও স্বর্গ-মর্ত-পাতাল আছে—এই অনুভব রাত্রির অকুণ্ঠ সমর্থন ছাড়া বুঝতে পারতাম না। একসময় আমি খুব ভয়ে ভয়ে পাতালের দরজায় হাত রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম। আগাগোড়া চোখ খোলা ছিল বলেই বুঝতে পেরেছিলাম কেন এই দরজাকে দেখে অপরাজিতা ফুলের কথা উচ্চারিত হয়েছে। চোখ আগাগোড়া বন্ধ রেখে আমি যেবার ফুল স্পর্শ করি সেবার ছিল দুর্গাপুজোর ছুটি। আমার অবসরপ্রাপ্ত পিতৃব্যের তিনঘরের কমলা এক-তলার পেছনদিকে ভোর বেলায় দাঁড়ালে পুকুরের পাশে জঙ্গম জবা দেখা যেত। পুকুরের অন্যদিকে ছিল শ্বেতপাথরের দোতলা। তার ছাদের ঘরে উঠে যাবার জন্য ঘোরানো সিঁড়ি ছিল। দু হাত দিয়ে আনত জবা সরিয়ে সরিয়ে পথ করছি। কাছেই আধা-সামরিক বাহিনীর পাঁচিল। প্রাতঃকালীন কুচকাওয়াজের বাজনা পাখিদের উড়িয়ে দিচ্ছিল। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে যে সাজি হাতে নেমে আসছিল সে ছিল শ্বেতপাথরের দোতলার মূল রমণী। বাগানে নেমে সে যখন জঙ্গম জবার দিকে ধাবিত আমার আট-দশ বছরের চোখে তাকে ফুলের থেকেও প্রস্ফুটিত দেখিয়েছিল। ফুল তুলতে তুলতে সে আমার নাম জানতে চেয়েছিল। নাম শোনার পর তার প্রশ্ন ছিল—তুমি জান নালীক মানে কী?—আমি বাবার কাছ

থেকে শিখে নেওয়া আমার নামের অর্থটি সহজেই শোনাতে পেরেছিলাম।
—নালীক মানে নললাগানো একরকমের অস্ত্র। অনেক আগের মানুষেরা এটা ব্যবহার করতেন।

—তোমার নামের আর একটা মানে আছে। সেই মানেটা জান?

—আর একটা মানে আছে নাকি? আমি জানি না তো।

—নালীক মানে মৃণাল। মৃণাল মানে পদ্মের ডাঁটা। তুমি পদ্ম দেখেছ তো?

— হ্যাঁ, আমি দু-একবার দেখেছি।

—আমার নাম কী বলো তো?

—কী?

—আমার নাম ভূমিকা। ভূমিকাদি বলতে অনেক সময় লাগে। তার চেয়ে ভূমিদি বললে অনেক কম সময় লাগবে। তুমি আমাকে ভূমিদি বলবে, কেমন? প্রথম দিনই ভূমিদির সঙ্গে গিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে আমি শ্বেতপাথরের দোতলায় প্রবেশ করেছিলাম। ভূমিদি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে সবকিছু দেখিয়েছিল। বড়ো বড়ো ঘর, বড়ো বড়ো জানলা, বড়ো বড়ো দিবালোক, আর বড়ো বড়ো নৈঃশব্দ্য। একটা ঘরে টেবিল-টেনিসের বোর্ড ঘর-জোড়া। আর একটা ঘরে সংগীতের নানারকম সরঞ্জাম। আর একটা ঘরে ভূমিদির বিছানা। ভূমিদি যেদিকে মাথা রাখে সেদিকের জানলা দিয়ে জবার যাবতীয় জগতে পৌঁছে যাওয়া যায়। দেখা যায় পুকুরে নেমে যাচ্ছে রাজহংসের দল। বড়ো বড়ো শুভ্রতার সেই সব দোলনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুনে ফেলা যায় প্রতিটি ঘরের টাঙানো ঘড়ি থেকে বেরিয়ে আসা শব্দশ্রী। আমিও প্রথম দিন শুনেছিলাম এবং শুনে ফেলে কমলা রঙের একতলায় ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।—আজ আসি ভূমিদি?

—এসো। মাঝে মাঝে চলে আসবে। তোমাকে টেবিল-টেনিস খেলা শিখিয়ে দেব। মাঝে মাঝে পিতৃব্যের বাড়ি চলে আসার সুযোগ ছিল বলে ভূমিদির কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছি বহুবার। ভূমিদি

কত কিছু যে করত তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। ভূমিদি আলতা পরত। নানা রকম কারুকার্যশোভিত একটি বাটিতে আলতা রেখে পালকের মতো নরম এবং কলমের মতো সরু একটি দণ্ড তার মধ্যে ডুবিয়ে নিত। তারপর তার পায়ের পাশগুলি রঞ্জিত করে সে পায়ের পাতার ওপরে একটি বৃত্ত আঁকত। সেই বৃত্তের মধ্যে ফুটিয়ে তুলত আর একটি ছোটো বৃত্ত। তখন তার দুটি পা সম্পদে পরিণত হত। পাশে বসে দেখতাম আলতা পরার কাজ শেষ হলে পায়ে তোড়া পরত ভূমিদি। এমনও হয়েছে পদসজ্জার পর সে আমাকে নিয়ে টেবিল-টেনিসের ঘরে চলে গেছে। আমার হাতে ব্যাট তুলে দিয়ে আমাকে একপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে অন্যপ্রান্তে ব্যাট ধরত ভূমিদি স্বয়ং। মাঝে মাঝে আমাদের খেলার মাঝ-খানে চাকা লাগানো চেয়ারে করে যাঁকে ওই ঘরে এনে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হত তিনি ভূমিদির বাবা। তাঁর সারা শরীর ভয়াবহ রকমের সাদা ছিল এবং উত্থানশক্তিরহিত সেই প্রৌঢ় আলখাল্লার মতো একটা পোশাক পরে ভূমিদির সফলতা আর আমার ব্যর্থতা লক্ষ্য করে যেতেন মন্তব্যহীন ভাবে। একদিন বিকেলে পুকুরের সামনে ভূমিদি আমাকে দেখে বলল—তুই তো আজ জেঠার বাড়ি থাকবি। কাল সকালের দিকে একবার আসিস তো। খুব মজা হবে। বলতে বলতে ভূমিদি ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। আমি জানতাম আর একটু পরেই ভূমিদি তার সংগীতের ঘরে চলে গিয়ে সন্ধ্যাবন্দনা করবে। রাতের শেষে এবং দিনের শেষে পিতৃব্যের একতলা থেকেই শুনতে পাওয়া যেত ভূমিদির বহুতল গলা। পরের দিন সকালে ভূমিদির বাড়িতে আমার সমবয়সী কয়েকজন ছেলে-মেয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ভূমিদি তার বাবার ঘরে আমাদের সবাইকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল। তার বাবাকে খাটের ওপর মার্জিত করেব সিয়ে রাখা হয়েছিল। ভূমিদি যারা কথা বলছিল তাদের চুপ করতে বলে কথা শুরু করল।—বাবা দেখবেন পলক না ফেলে তোমরা কতক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে পার। যে পলক ফেলবে সে উঠে গিয়ে অন্য কোনো দিকে বসে পড়বে।—প্রতিযোগীরা

প্রত্যেকে ভূমিদির বাবার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে শুরু করল। ভূমিদি ঘরের এক কোণে সরে গিয়ে আমাদের লক্ষ্য করার কাজে শান্ত। মনে আছে কিছুক্ষণ পর পর এক-একজন করে চুপচাপ উঠে গিয়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল। শেষে এমন হল ভূমিদির লক্ষ্যের সামনে আমিই একমাত্র বসে রইলাম। আমাকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল কাপ দিয়ে।

অপলক দৃষ্টির পরিচয় রাখার কয়েকদিন পরে আমি একটা ক্যাম্পে যোগদান করি। স্কুল থেকে আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে যাওয়া হয় এমন এক ছোট্ট শহরের কোলে যেখানে ছোটো পাহাড় আছে এবং নদী ছোটো ছোটো পাথরে সমাচ্ছন্ন। আমরা স্কুল থেকে গিয়ে একটা খুব লম্বা আর বড়ো স্কুলে পৌঁছে বুঝতে পারলাম আমাদের সাতদিন আনন্দে কাটবে। ওই সাতদিন ভোরে উঠে নিজেদের বিছানা নিজেরা তুলে ফেলে মাঠে গিয়ে লাইন করে পা মেলাতাম। বিকেলে অপরিহার্য ছিল সবাই মিলে নানা দিকে ঘুরে বেড়ানো। কখনও আমরা নদীর রাস্তা ধরে হাঁটতাম। কখনও আমরা শহরের দিকে যেতে যেতে দুপাশে রেখে যেতাম একই রকম দেখতে যত বাড়ির পর বাড়ি। একদিন ওপর থেকে বলা হল, তোমাদের আজ নিয়ে যাওয়া হবে 'দিগ্‌দর্শন'-এ।—'দিগ্‌দর্শন' —সে আবার কী? সারাদিন উত্তেজনায় কাটল। বিকেলে, আমরা যে ডাচসংগীত শিখেছিলাম আমাদের শহরে, সেটি গাইতে গাইতে এই ছোট্ট শহর ছাড়িয়ে গেলাম। বেশ ফাঁকা জায়গায় টিলা বানানো হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে টিলায় উঠলে সেই গোল টিলায় তীরচিহ্ন দিয়ে দিয়ে পৃথিবীর কয়েকটি বড়ো বড়ো দেশের দিক দেখানো হয়েছে। আমরা বৃহতের গন্ধ নিয়ে সেদিন স্কুলে ফিরেছিলাম। কিছু বিশ্রামের পর বেজে উঠেছিল বিউগল। সংকেত পেয়ে আমরা যখন বারান্দায় সঞ্চিত হলাম আমাদের জানানো হল একটু পরে প্রত্যেকের পরীক্ষা নেওয়া হবে। কী পরীক্ষা তখনও কিছুই জানি না। জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না। কে যেন বলে উঠল—এ বড়ো মজার পরীক্ষা, এর জন্য তৈরি থাকার প্রয়োজন নেই।

রাত বেশি হয়নি। একদিকে বড়োরা রান্না করছেন। অন্যদিকে পরীক্ষার আয়োজন শেষ হল। আমি আহূত হয়ে যে ঘরে গেলাম সেই ঘর পরদা দিয়ে বিভাজিত করা হয়েছে। কাউকে দেখতে পেলাম না। শুধু পরদার আড়াল থেকে ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল।—ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে ভালো করে শোনো। কতকগুলো শব্দ করা হচ্ছে। তোমাকে বলতে হবে ওগুলো কিসের শব্দ। টুং টাং। টিং টিং। ডুম্ ডুম্। দিম্ দিম্।—এই জাতীয় আওয়াজ হচ্ছিল। সাধ্যমতো বলে যাবার চেষ্টা হলে পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল। পরদার আড়াল থেকে একজন বেরিয়ে এসে আমার চোখ বেঁধে আমাকে নিয়ে গেল পরদার আড়ালে। সে আমার কবজি ধরে রেখে বলেছিল—তোমাকে নিয়ে গিয়ে কিছু জিনিস ছোঁয়ানো হবে। তোমাকে ছুঁয়ে দেখে বলতে হবে ওগুলো কী।—মনে আছে আমি তার ছুঁয়ে ছিলাম, লোহার বল ছুঁয়ে ছিলাম, কাঁচের গ্লাস ছুঁয়ে ছিলাম, আর ছুঁয়েছিলাম ধূপকাঠি।

তখন এমনই অবস্থা ছিল সব কথা সমস্ত ঘটনা ভূমিদিকে না শোনালে তার কোনো মূল্য থাকত না নিজের কাছে। ভূমিদি ক্যাম্পের সব কথা শুনতে শুনতে আমাকে বলেছিল—সামনের পুজোর ছুটিতে একদিন সকালে এসে সারাদিন আমার কছে থাকবি।—আমি তার কথা সানন্দে রেখেছিলাম। একদিন ছুটির সকালে পিতৃব্যের অনুমতি নিয়ে চলে এলাম ভূমিদির কাছে। ভূমিদি সেদিন আমার সঙ্গে টেবিল-টেনিস খেলল। ছাদে গিয়ে আকাশ আর পল্লী দেখল। ছাদ থেকে নেমে এসে আমাকে নিয়ে গেল তার স্নানঘরে। সেদিন ভূমিদির পরিচালনায় আমার স্নান শেষ হয়েছিল। দুপুরের খাওয়া সেরে আমি ভূমিদির শিয়রের জানলা দিয়ে রাজহংস প্রধাবন দেখছি এমন সময় ভূমিদি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

—নালীক, এখন আমি তোর একটা পরীক্ষা নেব। দেখি তুই পারিস কিনা। পরীক্ষার কথা শুনে এবং পরীক্ষক ভূমিদি জেনে আমি হাততালি দিয়ে বলে উঠেছিলাম—কী পরীক্ষা নেবে, ভূমিদি? নাও না, মজা

হবে খুব।

সুদৃশ্য কাপড়ের টুকরো দিয়ে আমার চোখ বেঁধে দিল ভূমিদি। আমি তো উত্তেজনায় ভরে আছি। আমার হাত ধরে ভূমিদি আমাকে নিয়ে এক এক জায়গায় থামছে এবং হাত বাড়িয়ে সামনের জিনিস ধরতে বলে জিজ্ঞেস করছে—বল্ তো এটা কী?—আমি প্রথমে বাজনার তারে হাত রেখেছিলাম এবং ঝংকার উঠেছিল। তারপর ঘরের আরও অনেক আসবাবে। প্রতিবারই আমার উত্তর শুনে নির্ভুলতার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে যাচ্ছিল ভূমিদি। পরীক্ষার প্রথম পর্ব শেষ হলে কিছুক্ষণের জন্য আমার চোখ খোলা রাখা হল। ওই সময়ে ভূমিদি কি যথেষ্ট অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল? কে জানে, আজ আর সেসব মনে পড়ে না। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবার আগে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে চোখ বেঁধে দেওয়া হল আমার। ভূমিদির নির্দেশ ভেসে এল একটু দূর থেকে।—আস্তে আস্তে সামনে চলে আয়। আমি দু হাত বাড়িয়ে দিয়ে সামনে এগোচ্ছিলাম। থামতে বলল ভূমিদি। থামলাম।—এবার হাঁটু ভেঙে বোস্।—বসলাম। দুটি জানু যখন মাটি ছুঁয়েছে ভূমিদি হাত বাড়িয়ে কিছু ধরতে বলল। আমার করতলে চুলের স্পর্শ পেলাম।—এ তো তোমার চুল, ভূমিদি।—ভূমিদি আমার হাত নিয়ে আর এক জায়গায় রাখল।—এ তো তোমার পেট ভূমিদি।—সর্বশেষে আমার হাত যেখানে রাখা হল সেটি অত্যন্ত অপরিচিত এবং নরম একটি কেন্দ্র। আমি কিছুতেই কিছু বলতে না পেরে বাঁ হাত দিয়ে চোখের বাঁধন খুলতেই আমার হাত সরিয়ে দিয়ে ধড়-মড় করে উঠে বসেছিল ভূমিদি এবং এক ক্ষণপ্রভায় বুঝতে পেরে যাই আমার হাত পাতালের দরজায় সংস্থাপিত ছিল।

আজ সন্ধ্যে-রাতের ট্রেনে অপর্ণা জয়কে নিয়ে শহর ছাড়ল। আফ্রিকা থেকে ছুটিতে এসে তার ডাক্তার মামা অনেক জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর অন্তত কয়েকটি ছোটো ছোটো ভ্রমণে তিনি অপর্ণাকে সঙ্গে নেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেসব সম্ভব হয়নি। এখন জয়ের স্কুল

পূর্ণমাত্রায় শুরু হয়ে গেছে। স্কুলে দিনের পর দিন না গিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর লোভনীয় সব সুযোগ গ্রহণ করতে অপর্ণা সাহস পায় না। সে এই কদিন জয়কে স্কুলে নিয়ে গিয়ে অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছে যে মায়েরা কতখানি গুরুত্বের সঙ্গে স্কুলে আসা-যাওয়ার ব্যাপারটাকে দেখে থাকে আজকাল। কত দূর দূর থেকে শিশুদের নিয়ে যুবতীরা চলে আসে এবং এসে চলে যাবার কথা ভাবতেই পারে না। তারা সাদা তিন-তলা বাড়িতে শিশুদের পৌঁছে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দলবদ্ধভাবে অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করার কোনো জায়গা নেই। ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে যুবতীরা এদিক-ওদিকের ছোটো ছোটো বারান্দায় বসে থাকে। যারা বারান্দাতেও জায়গা পায় না তারা দুপুরের অবহেলিত চায়ের দোকানে ভিড় করে। কদিন ধরে কী রোদ, কী তার সহিংস বিস্তার। ঘরের বিছানায় উঠে পুরোদমে পাখা চালিয়েও মানুষ নিজেকে খুব বিপন্ন মনে করছে। তখন এই যুবতীদের কথা ভেবে তারা নিশ্চয়ই প্রেরণা পেতে পারে। কিন্তু কদিন ধরে দুপুরের জমাট দানা ভাঙতে ভাঙতে আমি যখন বাড়ির কাছের অফিস থেকে বাড়ি ফিরি কোনো মাকেই আর দেখতে পাচ্ছি না। কাল সন্ধ্যেবেলায় অপর্ণা জয়ের স্কুলের নোটবুক আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। নোটবুকে কয়েকটি ঘর কাটা আছে। এর আগে জয় একদিন স্কুলে যেতে পারেনি। একটি ঘরে আমাকে লিখতে হবে সেই তারিখ। অন্য ঘরটিতে কেন আসতে পারেনি তা জানাতে হবে সংক্ষেপে। এর পরের দুটি ঘরের প্রথমটিতে আমার স্বাক্ষর এবং পরেরটিতে জয়ের ক্লাস যে নিয়ে থাকে সেই দীপ্ত যুবতীর স্বাক্ষর থাকবে। তার দীপ্তির কথা অপর্ণার মুখেই শুনেছি। আমি তাকে কোনোদিনও দেখিনি। দেখার প্রশ্নও ওঠে না। যে অফিস যেতে-আসতে স্কুলের সামনের রাস্তা শুধু অতিক্রম করে, দাঁড়ায় না মোটেই, তার পক্ষে স্কুলের কাউকে দেখা কখনোই সম্ভব হবে না। কিন্তু স্বাক্ষরের পাশে স্বাক্ষর জমে জমে আগামী দিনগুলিতে সম্ভব হবে এমন একটি চিত্র যা দাঁড়িয়ে থাকবে কেবলমাত্র যুগলমনস্কতায়। আমার অসতর্কতার মুহূর্তে

আমার হাত থেকে একটানে নোটবুক নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল জয়। অপর্ণা ছুটে গিয়ে নোটবুক উদ্ধার করে যখন ফিরে আসে আমি তখন প্রশ্ন রাখি।—অপু, কী ব্যাপার বলো তো? কদিন ধরে জয়ের স্কুলের মায়েদের এদিক ওদিক আর দেখছি না। তারা সব গেল কোথায়?

—স্কুলে নোটিশ বেরিয়েছে, কেউ আশেপাশের বারান্দায় বসে থাকতে পারবেন না।

—কেন, হঠাৎ এই বারণ কেন?

—শুনলাম পাড়ার অনেক বাড়ি থেকে স্কুলের কাছে নালিশ এসেছে।

—তারা তো কোনো ক্ষতি করছে না। খালি বারান্দায় বসে শুধু অপেক্ষা করছে।

—শুধু কি আর অপেক্ষা করে? নানারকম আলোচনা করে, আওয়াজ করে। সেটা হয়তো অনেকের পছন্দ হয় না।

—মায়েরা এখন তবে গেল কোথায়? কোথায় গিয়ে বসছে?

—ছাখো, এইসব অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আমাকে কোরো না। তারা কোথায় যাচ্ছে, কোথায় বসছে, কী করছে, কী খাচ্ছে—এসব আমার জানার কথা নয়। তুমি আজকাল বড়ো বেশি বাজে কথা বল। আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজে লাভ কী?

—তুমি এটাকে অপ্রাসঙ্গিক কী করে বলছ আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না। অপর্ণা আমার কথার উত্তর না দিয়ে আমাদের পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল।

সাত দিনের জন্য সে এই দ্বিতীয় বার সমুদ্রদর্শনে যাচ্ছে। শুক্রবার রাতে রওনা হল। ফিরবে রবিবার সকালে। জয়ের স্কুল শনি-রবিতে বন্ধ থাকে। তার মানে কার্যত পাঁচদিন জয় স্কুলে অনুপস্থিত থাকবে। এই পাঁচদিনের অনুপস্থিতিও অপর্ণার কাছে যথেষ্ট অস্বস্তির কথা ছিল। সবাই মিলে বলাতে সে শেষ পর্যন্ত মামার ডাকে সাড়া দিয়েছে। তার দেহের পাতাল স্পর্শ করার প্রথম দিনগুলিতেই আমরা ঠিক করে ফেলেছিলাম বাইরে কোথাও যেতে হলে আমরা দূরের এমন এক সমুদ্রতটে যাব

যেখানে কিছু মানুষ নিঃশব্দে সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের সংঘবদ্ধ করে দিয়ে গেছে বাইরের কোনো শক্তি নয়, বরং এক আন্তর বিশ্বাস যে কাজই হচ্ছে শরীরের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। কী কাজ সে সম্বন্ধে যাবার আগে আমাদের ধারণা খুব ভাসা ভাসা ছিল। কিন্তু গিয়ে আমরা বুঝতে পারি অমর্তের মূল্যে মর্তকে সম্মানিত করার কাজ চলছে। অপর্ণার প্রথম সমুদ্রদর্শন বলতে এই যাওয়াকেই বোঝায়। আমরা দু রাত ট্রেনে কাটিয়ে ভোর বেলায় ট্রেন ছাড়লাম। তারপর রিক্সা নিয়ে যে বাসে উঠব সেই বাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো। বাস খুব দ্রুতগামী ছিল। মাঝরাস্তায় থামলে 'কফি কফি' এই চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আমরা কফি খাই। অপর্ণাদের বাড়ির সফেন কফির সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। বাস যেখানে একেবারে থেমে যায় সেখান থেকে আবার রিক্সা নিয়ে এগোতে থাকি। একটা সাদা বাড়ির দরজায় আমাদের রিক্সা থামে। ভেতরে গিয়ে জানতে পারি আমাদের বাসস্থান ঠিক হয়েছে একটা ঝকঝকে তিনতলার দোতলায়। একটি বড়ো ঘর। ঘরের ভেতরে জলকলের ঘর আছে। ঘরে খাট আছে, তাক আছে ঘরের দেয়ালে, আর আছে ছোটো টেবিল, ছোটো চেয়ার। দুপুরের স্নান সেরে আমরা দুপুরের খাওয়া সারতে আরও একটা সাদা বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে বিরাট লাইন পড়েছে। সবাই খাবার পাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে এবং নেই কোনো শ্রীহীন শব্দ। আমরা কেনা কুপন জমা দিয়ে অনেক পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং খুবই অল্প সময়ের মধ্যে চলে এলাম সবার সামনে। আমাদের হাতে একজন থালা তুলে দিলেন। একজন ভাত দিলেন, একজন তরকারি, একজন দুধ বা দই। আমাদের খাবার নিয়ে আমরা অন্য একটি ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে বসেছিলাম। প্রত্যেকের সামনে ছিল জলচৌকির মতো কাঠের ছোটো ছোটো আধার। সেখানে খাবার রেখে খেতে গিয়ে দেখেছিলাম আমাদের সামনে-পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে অজস্র মানুষ কোনো কথা না বলে খেয়ে চলে যাচ্ছে এবং যারা উঠে যাচ্ছে তাদের জায়গায় থালা হাতে করে বসে পড়ছে অজস্র মানুষ। এই যাওয়া-আসার পরিচ্ছন্নতা দেখতে দেখতে আমাদের খাওয়া শেষ হল।

ঘর থেকে উঠে আসতেই দেখলাম আমাদের হাত থেকে থালা নেবার জন্য সুদর্শন মহিলা এবং পুরুষেরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। থালা হাত থেকে হাতে যেতে যেতে দ্রুত চলে যাচ্ছে বড়ো বড়ো জলাধারের সামনে। একবার ঠাণ্ডা জলের চৌবাচ্চায় এবং আর একবার গরম জলের চৌবাচ্ছায় থালা মার্জিত হয়ে পেছনের রাস্তা দিয়ে হাতে হাতে চলে যাচ্ছে খাবার ঘরে আবার। মোটা জলের ধারায় হাত মুখ ধুয়ে এসে আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আধার শুদ্ধ করার এই ব্যাপ্তি দেখে দোতলার ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম। অপর্ণা সেভাবে জানত না বলে ওকে জানিয়েছিলাম, যাঁরা থালা ভরিয়ে দিচ্ছেন এক এক করে এবং যাঁরা থালা খালি হবার পর তাকে শুদ্ধ করছেন ক্রমান্বয়ে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই সমুদ্রতটে আসার আগে আমরা যাকে প্রতিষ্ঠা বলে থাকি তার শিখরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা যাকে বুদ্ধি বলে থাকি তার অতন্দ্র সব চর্চা করেছিলেন। আমরা যাকে অবিশ্বাস বলি সমাচ্ছন্ন ছিলেন তার গরিমায়।

আমরা বিকেলে একটি বেদীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হলুদ ফুলের যে গাছ তার তলায় বেদী। বেদীর তলায় এখানকার সমস্ত কিছুকে যাঁরা ভাবে ও কর্মে সংগঠিত করেছেন, যাঁরা পৃথিবীকে অস্বীকার না করে তাকে দিয়েছেন নতুন মর্যাদা, সেই দুজন পুরুষ ও নারীর মরদেহ। কাছেই প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের ঠিক পাশে যে শান্ত মহিলা বসে আছেন তিনি অপর্ণার থেকে বয়সে এমন কিছু বড়ো নন। নানা রঙের ত্বক নিয়ে, নানা রঙের পোশাক পরে মানুষের পর মানুষ এসে সেই মহিলার হাত থেকে নেওয়া একটা মোটা আর একটা সরু ধূপকাঠি প্রদীপের শিখায় ধরছে। বেদীর ওপরে গাছ থেকে ফুল ঝরছে এবং মানুষের হাত থেকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ধূপকাঠি। কেউ কেউ বেদী থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে মেরুদণ্ড সোজা রেখে এবং চোখ না খুলে আসীন। বেদী থেকে সমুদ্র বড়ো জোর আমার বাড়ি থেকে আমার অফিস। সমুদ্র মানে শুধু কি নীলিমা, চৈতন্যবর্ণ নয়? সমুদ্রকে ঘিরে রাখা হয়েছে লম্বা পাঁচিল দিয়ে।

পাঁচিলের নীচে কালো কালো পাথর। ঢেউ এসে কালো পাথর ধুয়ে দিচ্ছে। শুনলাম একটু দূরে জাহাজঘাটা। দুটি জাহাজ কিছুদিন আগেও এসেছিল। অপর্ণাকে নিয়ে জাহাজ দেখার ইচ্ছে একবার মাথা তুলে মিলিয়ে গিয়েছিল। সমুদ্র থেকে আমরা সোজা চলে এসেছিলাম খেলার মাঠে। সেখানে ভারতের মানচিত্র টাঙানো ছিল। তার সামনে বেজে উঠল ব্যাণ্ড। আমরা বালির ওপর মাদুর পেতে শুনলাম। বালির ওপর মাদুর পেতে দেখলাম চলচ্চিত্র। যখন রাতের দোতলায় ফিরে যাচ্ছি বিপুল বৃষ্টি নামল। একটা আচ্ছাদনের তলায় দাঁড়িয়ে চশমাপরা এবং স্নিগ্ধ এক বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করে উঠলাম—এখানে কতদিন আছেন ?—তাঁর সহাস্য উত্তর ছিল—তা প্রায় চল্লিশ বছর হবে।

তার পরের দিন অপর্ণা আমাদের শহরের অনেকের মুখ মনে করে করে অনেক কিছু সংগ্রহ করল। আমি পছন্দ করলাম কাঁধে ঝোলানো যায় এমন একটা সবুজ ব্যাগ।

ফেরার পথে ঠিক ছিল সেলাইভবন হয়ে ফিরব। এই সূচীকর্মকেন্দ্র যাঁর অধীনে তিনি গান গেয়ে একদিন চারদিক জয় করেছিলেন। আমাদের বারবার করে বলে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না, আর গান এখন তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমরা যেন হুট করে গান গাইবার অনুরোধ না জানাই। মহিলারা মাথা নীচু করে সীবনব্যস্ত, বড়ো বাড়ি এবং কোথাও কোনো অতিরিক্ত কথা নেই। পথপ্রদর্শক তাঁর ঘরে তাঁর সামনে আমাদের নিয়ে দাঁড় করালেন। সেই অশীতিপর যোষিৎ দ্বিধার সঙ্গে প্রণাম গ্রহণ করলেন। তাঁর মুখোমুখি বসে আমি সব নিষেধ ভুলে গিয়ে বলে ফেললাম—দিদি, অনেক দূর থেকে বড়ো আশা করে এসেছি। একটা গান শুনব।—তিনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে পাশে দাঁড়ানো পথপ্রদর্শককে বললেন—হারমোনিয়াম নামাও।—হারমোনিয়াম নামানোর কাজ চলছে, ইতিমধ্যে কী গান শুনতে চাই সেই মনোবাসনার কথা তুললাম ধীরে ধীরে। তিনি সেদিন আমার অনুরোধের গানই শুনিয়েছিলেন। গান শেষ করে তাঁর

শেষ কথা ছিল—মৃত্যু পর্যন্ত গান করে যাব।—আমাদের সেদিন ঘিরে রেখেছিল তাঁর অচ্যুত গলা। পথে নেমে অপর্ণাকে প্রশ্ন করেছিলাম—একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ ?

—কী ?

—হারমোনিয়াম বরাবর আস্তে বেজেছে। গলাকে ছাপিয়ে ওঠেনি। আরও আছে।

—আর কী ?

—তিনি স্মৃতি থেকে গান গাইলেন। সামনে কোনো বই বা খাতা খুলে রাখেননি।

কিন্তু এবারের সমুদ্র কাছের সমুদ্র। সন্ধ্যেরাতে ট্রেনে উঠলে পরের দিন সকালবেলায় পৌঁছে যাওয়া যায়। আর অপর্ণার মামা যেখানে যেখানে যাবেন বলে শুনেছি সেসব জায়গায় যত ভিড় তত শব্দ। মামার তালিকায় যেসব জায়গার নাম নেই তেমনি দু-একটা নামের কথা বারবার অপর্ণাকে জানিয়েছি। বারবার বলেছি, মামা না গেলেও তুমি অন্তত জয়কে নিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো। অভিজ্ঞতা হবে। কিভাবে যেতে হয়, রিকশাচালককে কী বলতে হয়, সে-সবও বলে দিয়েছি। রিকশা কিন্তু লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত সব সময় যাবে না। এমন জায়গার কথা বলেছি যেখানে রিকশা থামিয়ে ক্রমে ক্রমে উঠে যেতে হবে। ঝাউ আর ঝাউ চতুর্দিক আলো করে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়া দিলে মনে হয় সমুদ্র খুব কাছে। উঠে যাবার পর নীচের দিকে তাকালে তরুবিস্তৃত সবুজ ছাড়া অন্য কোনো রঙ মনে আসবে না। কেউ কেউ ওই সময় তৃষিত হয়ে পড়ে। অন্তত আমি তো হয়েছি। মনে হয় মুখের সামনে জলপাত্র ধরলে মহিমার একটা বড়ো প্রকাশ ঘটে যাবে। আর আশ্চর্য এই, তখনই তো উঠে এসে কাছে দাঁড়াবে এক স্থানীয় বিধবা। হাতে জল নিয়ে সে প্রশ্ন করবে জলের প্রয়োজন আছে কিনা। আমি জানি অপর্ণা মামার সঙ্গে মিলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ওসব জায়গায় গিয়ে উঠতে পারবে না। তবু

ট্রেন ছাড়ার আগেও জয়কে কোলে নিয়ে ওকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে মিটিয়েছি।

পিসিমার এই ঘরে চলে এসে অপর্ণা দু-তিন মাস রাতের শেষে এবং দিনের শেষে নিয়ম করে গলা সাধত। আমি আশান্বিত হতাম। মানুষকে স্বক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতে দেখলে আশা হয়। ধীরে-ধীরে তার হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে বসার সময়টা পালটে যেতে থাকে। দুপুরের স্নান সেরে খেতে যাবার আগে এবং সন্ধ্যের বেশ কিছু পরে যখন রাতের মধ্যে এসে গেছে যথেষ্ট লিপ্তি, অপর্ণা বসত। একদিন না বলে পারলাম না—অপু, সব-কিছু করার একটা করে সময় আছে। তুমি কিন্তু অসময়ে বসছ।

—কিছু করার নেই, সময়ে বসতে আমার লজ্জা করে। ভোরে উঠে চিৎকার না করে বাড়ির কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখাই তো ভালো।

ধীরে ধীরে অসময়ের এই বসার পরিবর্তে শুরু হয়ে যায় এক নতুন ধরনের বসা। পাড়ার শেষ দিক থেকে মার বন্ধু এলে মা ডাকতেন—অপু শোনো, তৃপ্তিদি এসেছেন। হারমোনিয়ামটা নামাও। উনি কিন্তু গান খুব ভালোবাসেন।—কিংবা বুবুনের সূত্রে কেউ এসে বলে বসল—বউদি বসুশ্রীতে কী যেন বইটা চলছে, তাতে একটা রবীন্দ্রসংগীত আছে। বুবুন বলছিল গানটা আপনি জানেন। একটু শোনান না।—এইসব ক্ষেত্রে অপর্ণা হাত মুছতে মুছতে হারমোনিয়ম নামিয়ে বসে পড়ত। এখনও বসে পড়ে। এই তো কালও বসেছিল। জয়ের কান্না থামাতে না বসে উপায় ছিল না। জয় খুব কম জিনিসই মুখে তোলে স্বেচ্ছায়। তাকে খাওয়াতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হয় অপর্ণা। রূপকথার সাহায্য নিয়ে, অভিনব সব প্রলোভনের সাহায্য নিয়ে কোনো কাজ হয় না যখন, তখনই তো অপর্ণাকে বলতে হয়—মাম্পি শোনো, তুমি যদি সব খেয়ে ফেল আমি তোমাকে বড়ো খেলনা নামিয়ে দেব।—এই টোপটি সাধারণত গিলে থাকে জয়। চুপচাপ যা মুখে নেবার নিয়ে নেয়। কিন্তু খেয়ে উঠেই হারমোনিয়াম পাবার জন্য তার অস্থিরতা কান্নার রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তাকে তখন আর কোনো কিছু দিয়ে ভোলানো যায় না। অপর্ণা বাধ্য

হয় 'বড়ো খেলনা' নামাতে। একগাল হেসে জয় তখন বলবেই—মা, তুমি গান করো, আমি বাজাচ্ছি।—কিন্তু তানপুরা নামানোর উপলক্ষ বহুদিন হল আসেনি। দেয়ালে টাঙানো তানপুরার আবরণী যতই চিত্রিতগাত্র হোক, ধুলো কাউকে ত্যাগ করে না এবং মাকড়সার কাজ কে বলল থেমে থাকে ?

বারান্দার আলো জ্বলে উঠল। স্নানঘরে যেতে গেলে পিসিমার ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হয়।—কে ওখানে ?

বুবুনের ভারী গলা ভেসে এল—আমি।

সেও কি আজ আমার মতো বিনিদ্র ? আমি যখন জল-আলো-বাতাস নিয়ে লেখা কবিতা পড়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি, বুবুন তখন কাছের বস্তিগুলোতে গভীরভাবে ঢুকে যাচ্ছে রোজ। মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরত না। আমি কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে বুবুন ফেরেনি, এ-কথা জেনে মার মুখের দিকে তাকিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজে বেড়াতাম। মাঝে মাঝে পেয়েও যেতাম তাকে। হয়তো কোনো বস্তির ভেতর দিয়ে পথের সন্ধান করছি, দু-চারজন হঠাৎ আমাকে ঘিরে ফেলল।—কী চাই ? এখানে ঘুরঘুর করছেন কেন ?—তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে যেতাম। কঠিন আর রাতজাগা চোখ।

—আমি একজনকে খুঁজছি। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছি।

—কে সে ? কাকে খুঁজছেন ?

—মালিক ভট্টাচার্য, ডাকনাম বুবুন, শান্তি লেনে থাকে।

নাম শোনার পর আরো সাবধানী এবং আরো ভয়ংকর হয়ে তারা আমাকে আলাদা করে সরিয়ে নিল।—তার সঙ্গে আপনার কী দরকার, তাড়াতাড়ি বলুন।

—ও আমার ছোটো ভাই। কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরেনি। তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

যারা আমাকে ঘিরে ধরেছিল এবার তাদের মধ্যে নেমে এল কোমলতা।

—আচ্ছা, আপনি বুবুনদার দাদা, নালীকদা। কিছু মনে করবেন না, আমরা বুঝতে পারিনি। চলুন আপনার সঙ্গে বুবুনদার দেখা করিয়ে দিচ্ছি।

ওদের মধ্যে একজন আমাকে নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর এক জায়গায় থামল এবং শিস দিল। সেই শিস শুনে গলির ভেতরের কোনো এক গলি থেকে যে বেরিয়ে এল সে এক নিরুদ্বিগ্ন কিশোরী। বলা যায় তারই পরিচালনায় থেকে আরও খানিকটা যাবার পর আমি আমার অনুজের দেখা পেয়েছিলাম।

বুবুনের দিকে ভালো করে যেন এতদিন তাকানো হয়নি। না হলে সেই গূঢ় গলির জগতেই প্রথম লক্ষ্য করতাম না তার চেহারার অসম্ভব অধঃপতন। মুখমণ্ডলে কিছুদিন আগে দেখা কমনীয়তা একেবারে নেই। তার জায়গায় বিরাজ করছে একটা গোপন কাঠিন্য।—কী ব্যাপার, দাদা?

—কাল বাড়ি ফিরিসনি, মা খুব চিন্তা করছে।

—মাকে তো বারবার বলেছি, আমার চিন্তা ছেড়ে দাও। ধরে নাও আমি নেই।

—আজ কিন্তু একবার বাড়ি যাস।

—চেষ্টা করব, তবে কথা দিতে পারছি না। আর কিছু বলার আছে?

—না। আজ একবার চেষ্টা করিস কিন্তু।

হঠাৎ কাছেই কোথাও শঙ্খধ্বনি হয়েছিল। বুবুন যেন একটু বিচলিত হয়ে পড়ল আমাকে নিয়ে।—দাদা, তুমি এই ছেলেটার সঙ্গে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও।

সেদিন বুবুন চেষ্টা করেছিল কি না জানি না। তবে তাকে বাড়িতে কখনও দেখা যায়নি। তার বদলে নিথর রাতে দরজা খুলে দেখা গেল পুলিস আর আর পুলিস। সদর দরজা থেকে শুরু করে পিসিমার ঘর পর্যন্ত সমস্ত বাড়ি ঘিরে ফেলা হয়েছে।—মালিক কোথায়, বুবুন কোথায়? চুপ করে থাকবেন না। তাড়াতাড়ি বলুন। বাবা কিছু বলার আগেই তিন-চারজন সশস্ত্র অবস্থায় ভেতরে ঢুকে পড়ে ঘরে ঘরে মশারি তুলে

খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে। একজন মার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে আমার বইয়ের আলমারি খুলে শুধু বই নয়, কবিতার খাতাও দেখে নিল। কিছু না পেয়ে যাবার আগে বাবাকে বলল—একটু বাইরে চলুন। বাবা বাইরে থেকে ঘুরে এসে বিস্মিত হয়েছিলেন। সমস্ত পাড়া সামরিক কর্মীরা ঘিরে নিয়ে বসে আছে, আর পুলিস ঢুকে যাচ্ছে সমস্ত রকম অন্দরে। যে বুবুন কিছুদিন আগেও বাবাকে জড়িয়ে ধরে যুদ্ধের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত, বাবা অফিসের কাজে বাইরে গেলে যে প্রতিদিন একটা করে চিঠি লিখত—তুমি ফিরে এসো, তার জন্য এত তোড়জোড়, এত আয়োজন, এত সতর্কতা?

পরের দিন তখনও বিকেল হয়নি। নানা গুঞ্জন শুনেছিলাম বলে তাড়াতাড়ি কলেজ থেকে ফিরে এসেছি। মা জেগে শুয়ে আছেন এবং পিসিমা এই ঘরে টুকিটাকি কাজে নিমগ্ন। বাবা ট্যাক্সি করে এসে নামলেন। বাবাকে নিঃস্ব দেখাচ্ছিল। অসময়ে বাবাকে চলে আসতে দেখে মা দৌড়ে এলেন।

—কী হয়েছে গো?

—একটু আগে অফিসে একটা ফোন পেলাম। কে ফোন করেছে জানতে পারলাম না। কথা হল। আজ ভোরে ছাত্রসঙ্ঘের পাশের বাড়ি থেকে বুবুনকে ধরে নিয়ে গেছে। সেই একই ট্যাক্সিতে আমি বাবার সঙ্গে আদালতে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম। যেতে যেতে শুনলাম বুবুনকে যখন ধরে তখন ওর সঙ্গে আরও পাঁচজন ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় ওদের ঘিরে ফেলে ধরা হয়। ছজনের মধ্যে একজনকে এমন-ভাবে মারা হয় যে শেষ পর্যন্ত জীবিত থেকে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো তার পক্ষে আর সম্ভব হল না।

বুবুন সাতদিন পুলিস হাজতে ছিল। এই সাতদিনের বিভিন্ন মুহূর্তে নিপীড়নের পরিমাণের কথা ভেবে মা আর পিসিমা সাশ্রু ছিলেন। শেষে যখন তাকে জেল হাজতে নিয়ে যাওয়া হল সাক্ষাৎকারের প্রথম সুযোগে মা আর পিসিমা আমার সঙ্গে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সেদিন সারাদিন

ধরে বুবুন আর তার বন্ধুদের জন্য খাবার বানাতে ব্যস্ত। নির্মেঘ বিকেলে আমরা জালের ওপারে বুবুনকে পাই। বুবুন মার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। পিসিমাকে বলে উঠেছিল—ভালো আছ তো? আর আমার কাছে বলতে চেয়েছিল সবাই যেন সাবধানে থাকে। একটা খাঁচার মধ্যে প্রিয়জনকে পেয়ে সবাই অনেক কিছু বলতে চায়। ফলে অন্যান্য চিৎকারে আমাদের গলা ডুবে যাচ্ছিল মুহুর্মুহু। তা ছাড়া সাদা পোশাকে অনেক সময় গোয়েন্দা বিভাগের লোক আশেপাশে থেকে যায় এমন একটা কথা শুনে এসেছিলাম বলে ভেবেচিন্তে কথা বলতে হচ্ছিল। কিন্তু চলে আসার আগে পিসিমা আর সামলাতে পারলেন না।—খুব মেরেছে, না রে? আমি সব জানতে পেরেছি। যারা মেরেছে তাদের ভালো হবে না এই বলে গেলাম।

হাজতে দু মাসের বেশি বুবুনকে থাকতে হয়নি। কিন্তু সে স্নাতক হতে পেরেছিল অনেক পরে, অত্যন্ত ধীরে ধীরে। যারা তার সঙ্গে বিপ্লবে বিশ্বাস রাখতে পেরেছিল তাদের একজনকেও আজ আর বসে থাকতে দেখি না। কিন্তু বুবুন বসে থাকে। বাড়ির কিছু কাজকর্ম বাদ দিলে হয় সে জয়ের সঙ্গে বসে থাকে, নয়তো তাকে দেখা যায় বাড়ির সামনের গলিতে খালি গায়ে ছোটো ছোটো ছেলেদের সঙ্গে। আমি ওকে টাইপটা আবার অভ্যাস করতে বলেছি। কী করবে জানি না। আমাদের বাড়িতে আসতে গেলে বাস থেকে যেখানে নামতে হয় তার কাছেই সারি সারি মাংস টাঙানো থাকে এবং ক্রেতাও অপেক্ষা করে সারিবদ্ধ হয়ে। এই দোকানের ঠিক গায়ে গাড়ি চালানো শেখানো হয়ে থাকে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না অপর্ণা সেদিন ঠিক কোন্ জায়গায় কথা বলছিল। অপর্ণা কোনো সাধারণ কাজে বেরিয়ে গুনগুন করে ফিরে এল।

—একটা সুখবর আছে, শুনবে?

—নিশ্চয়ই।

—কালুর মাংসের দোকান আর গাড়ি চালানো শেখানোর যে অফিসটা আছে ওর ঠিক মাঝখানে একটা নতুন সাইনবোর্ড দেখে ঢুকে-

ছিলাম। ওখানে সামনের মাস থেকে গান শেখাবে। ডিপ্লোমা দেবে। ভাবছি ভরতি হব। এখন কী শেখায় জান ?

—কী ? নাচ-টাচ হবে বোধ হয় ?

—না না, এখন যোগ-ব্যায়াম শেখাচ্ছে। বড়ো বড়ো লোকের মেয়েরা গাড়ি করে শিখতে আসে।

—আর কিছু শেখায় না ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। স্পোক্‌ন্‌ ইংলিশের ক্লাসও হচ্ছে। বুবুনকে ভাবছি ভরতি হতে বলব। ঠিকমতো কথা বলতে পারলে অনেক জায়গায় চাকরি পাওয়া যায়।

অপর্ণা বুবুনকে কথোপকথনের ক্লাসের কথা বলে রাজি করিয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আশা করা যায় সমুদ্রতট থেকে ফিরে অপর্ণা আর বুবুন দুজনেই একটা প্রণালীর মধ্যে চলে যেতে পারবে।

ওরা যখন কেউ গান শিখবে, কেউ বিদেশী ভাষায় কথা বলার চেষ্টা শুরু করে দেবে কী করব আমি তখন ? আমিও কি কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ব ? না না, একেবারেই নয়। তবে কি সেই সময় বাড়ি বসে জয়কে পড়াব ? তাকে কোলের কাছে বসিয়ে বলব—মাম্পি, আনটি তোমায় কী করতে দিয়েছে দেখি ? তাহলে তো কোনো কথাই ছিল না। অপর্ণাও আমাকে এ-ব্যাপারে বুঝে গেছে। সেও আমার ভরসায় ঠাকুরদা-ঠাকুমার পাশে রেখে যাবে না ছেলেকে। বরং বেরোনোর কিছু আগে দেবরকে বলবে—তুমি একটু শোণির কাছে মাম্পিকে রেখে এসো। ফেরার পথে ওকে নিয়ে আসব। বইগুলো ওর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। শোণিকে বোলো হোমটাস্কটা করিয়ে দিতে।—অপর্ণা জানে সন্ধ্যের ঠিক পরে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। তবে কোথায় যাই, কেন যাই, কার সঙ্গে যাই, এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর তার আজও ঠিক করে জানা হয়ে ওঠেনি। ঠিক করে জেনে ওঠা এককথায় বলা যায় অসম্ভব। তার প্রধান কারণ কোথাও যাবার ঠিক আগে আমি নিজেও জানি না সত্যি কোথায় যাচ্ছি।

এই না-জানার প্রতিফল কতখানি অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে তার প্রমাণ বহু আগেই পাওয়া হয়ে গেছে। যে বয়সে সাধারণত উপনয়ন হয়ে যায় বাবা সেই বয়সের মধ্যে আমার উপনয়নের কাজটা সেরে ফেলতে পারেননি। মার যুক্তি ছিল, আমার অন্নপ্রাশনের ব্যাপারটা অত্যন্ত দীনভাবে যেহেতু সম্পন্ন হয়েছিল, উপনয়নের অনুষ্ঠানটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন আছে সেই কারণেই। গুরুত্ব দিতে গেলে অর্থের সক্ষমতা দরকার। বাবার সেই সক্ষমতা যখন এল তখন আমি উপনয়নের সাধারণ বয়স পেরিয়েছি। অসাধারণ বয়সে বাবা অনেক খরচ করে আমার উপনয়ন দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে বিলম্বের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। পিসিমার এই ঘরে যাবতীয় অনুষ্ঠান ঘটে যায়। এই অনুষ্ঠানে আচার্যের ভূমিকায় ছিলেন আমার এক কাকা। তাঁর আরও একটা বলার মতো ভূমিকা ছিল। আমি কোনো হাসপাতালে হইনি। শুনেছি আমাদের দেশের বাড়ির একটা অংশে একটা অনুজ্জ্বল বেষ্টনীর মধ্যে এক নতনেত্র ধাত্রীর সামনে আমি ভূমিষ্ঠ হই। ফলে জন্মসময়জনিত এমন একটা সুযোগের সৃষ্টি হয়, বাবার অনুপস্থিতিতে কাকা আমাকে স্কুলে ভরতি করতে গিয়ে যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এসেছিলেন। তিনি শুধু আমার জন্মবছরটিকে এক বছর এগিয়ে এনেই ক্ষান্ত হননি, এগিয়ে এনেছিলেন আমার জন্মদিনটিকেও। সতেরোই জুলাইয়ের বদলে নথিবদ্ধ হল পনেরোই আগস্ট। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের কথা আমি অনেক পরে জেনেছিলাম এবং জেনেও এমনভাবে ভুলে গিয়েছিলাম যে তা হয়েছিল না-জানারই শামিল।

সবে উপবীত ধারণ করেছি। মস্তক মুণ্ডিত। লিখিত পরীক্ষায় পাস করার ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষায় হাজির হবার চিঠি এল এক শিল্পনগরীর উজ্জ্বল এনজিনিয়ারিং কলেজ থেকে। ভোরের ট্রেনে উঠে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলাম। মাথায় টুপি ছিল। পরিধানে সাদা জামা, সাদা প্যান্ট। টুপির রঙ ছিল কালো। গরমে টুপি রাখা যাচ্ছিল না। টুপি খুলে বাইরে পায়চারি করছিলাম। ভেতর থেকে ডাক এলে পরে

নিয়েছিলাম টুপি। আমি সত্যিই জানতাম না এই কৃষ্ণতা মাথায় চাপিয়ে ভেতরে যেতে গিয়ে আদতে কোথায় যাচ্ছি। তিনদিকে তিনজন গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। আমাকে বসতে বলা হল।—তোমার নাম কী, কোথায় থাক, এইসব মামুলি প্রশ্নের পর জানতে চাওয়া হয়েছিল পড়াশুনোর বাইরে আমার কী করতে ভালো লাগে। খুব ভয়ে ভয়ে বলে ফেলে-ছিলাম, কবিতা লিখতে ভালো লাগে। একজনের সহজ নির্দেশ কানে এল।—মনে থাকলে তোমার স্বরচিত একটা কবিতা শোনাও।—আমি যে কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলাম তার পুরোটাই তিনজন খুব শান্তভাবে শুনেছিলেন। সেই বয়ঃসন্ধিকালে পূর্ণবয়স্কদের সেই সম্মানপ্রদর্শন আজও আমার কাছে দুর্লভ লাগে, আমাকে আজও কৃতজ্ঞ করে তোলে। অতঃপর প্রশ্নরূপে এল বাণ।—তোমার জন্মদিনটা কী কারণে বিখ্যাত বলো তো ?—আমি অসহায়ভাবে ভাবতে শুরু করলাম, কোনো কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না, সতেরোই জুলাই আবার কী কারণে বিখ্যাত! আমার এই মৌন দেখে বিস্ময়ের মতো কিছু একটা ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত ঘরে। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি নন, অন্য একজন শেষে বলে উঠলেন —এ কী, পনেরোই আগস্ট কী কারণে বিখ্যাত বলতে পারছ না! পরমুহূর্তে বলতে পেরেছিলাম। কিন্তু তখন বড়ো দেরি হয়ে গেছে।

শহরে ফিরে বাইরের দিক থেকেও এমন একটা অস্থিরতা সূচিত হল যা শুধু বাবাই নন, আমি নিজেও বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কোথায় গেলে শেষ পর্যন্ত কোন এক জায়গায় পৌঁছে যাওয়া যায় তা নির্ণয় করার মতো শক্তি আমার ছিল না এবং যাদের নির্ণয় করার মতো শক্তি ছিল তাদের মতামতও আমার কাছে হয়ে উঠছিল অবান্তর। এই পর্বে আমি একটা বছর ব্যয় করি বড়ো বড়ো কয়েকটা বাড়ির রসায়ন, ভূতত্ত্ব, গণিত আর পরিসংখ্যান বিভাগগুলিতে শুধুমাত্র একের পর এক নাম লিখিয়ে রেখে। নতুন বছরের শুরুতে বন্ধুবান্ধবদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একসময় বুঝতে পারি সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে। এক উজ্জ্বল শ্রাবণে, পড়ব এই মন নিয়ে শহর থেকে একটু দূরের যে বাড়িতে অর্থ-

নীতিতে নাম লিখিয়ে আসি তা তখনও জল হাওয়া ও গাছগাছালির অধিকারে।

সেই বাড়িতে কেটে গেছে অন্তত ছ বছর। বারো বছরকে একযুগ ধরলে অর্ধযুগ নিঃসন্দেহে। বিভাগীয় প্রাধান ছিলেন দীর্ঘদেহী। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এমন একজন অর্থনীতিবিদের নিকটতম সহকারী। তিনি একটা বিশেষ বিষয়ের ওপর বিশেষ ক্লাস নিতেন। তাঁর সেই ক্লাসে তাঁকে বাদ দিলে আর যে দুজন উপস্থিত থাকত তাদের একজন ভূপালী আর একজন আমি। দীর্ঘদেহী অধ্যাপক আমাদের কোনো ক্লাসরুমে নিয়ে যেতেন না। তাঁর নিজের ঘরে তিনি আমাদের অপেক্ষায় বসে থাকতেন। কোনো কোনো দিন ভূপালী আমার আগে এসে অধ্যাপকের সামনের চেয়ারে বসে গল্প করত। আমি এলেই তিনি জিজ্ঞেস করে উঠতেন—এবার তাহলে বলি?—আমরা সম্মতি জানালে তিনি বেল বাজিয়ে তিন কাপ কফির জন্য বলে দিতেন। কফি এলে তিনি লম্বা সিগারেট বের করে আমাকে অনেকদিন বলেছেন—কোনো লজ্জা কোরো না। আমি তো তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, ধরো।—তাঁর এই বলে যাওয়া এবং আমার অনিচ্ছা প্রকাশ খুব উপভোগ করত ভূপালী। কফি খাওয়া যতক্ষণ শেষ না হত তিনি পাঠ্যবস্তু থেকে অনেক দূরে থাকতেন। তিনি বহুদিন বহুদূরের ওলন্দাজদের সঙ্গে কাটিয়ে দিয়েছেন। কফির অবসরে তিনি হাসতে হাসতে এনে ফেলতেন সেইসব দীর্ঘায়ু সঙ্গতাপ। আমি বহুদিন আগে ক্যাম্পে যে ডাচ সংগীতের সঙ্গে মিলিত হয়ে ছিলাম, যে সুর গলায় নিয়ে আমরা দলবদ্ধভাবে এগিয়ে গিয়েছিলাম দিগ্‌দর্শনের দিকে, সেই সুরের কথা অধ্যাপককে বলে দেবার ইচ্ছে জাগত। প্রবল ইচ্ছের চাপে যেদিন তাঁকে সেই সুরের কথা বলতে বাধ্য হলাম, তিনি তাঁর প্রসারিত করতল আমার করতলে রেখে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আমাকে অব্যাহতভাবে অনুরোধ করেছিলেন সেই সুরের যেটুকু মনে আছে সেটুকু শুনিয়ে দিতে। তাঁর অনুরোধের অকৃত্রিমতা আমার সমস্ত লজ্জাকে হরণ করেছিল। কোনোদিনও, বহু লোকের

গলার সঙ্গে গলা মেলানো ছাড়া, আমার কোনো গান করা ছিল না। কিন্তু সেদিন সবকিছুকে লঙ্ঘন করে ভূপালীর অবাক দৃষ্টির সামনে আমাকে গুনগুন করতে হয়েছিল।

আমরা বিশেষ ক্লাসের পরে নির্বিশেষ ক্লাসে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ছট-ফট করতাম। দুজনের বদলে সেখানে অন্তত কুড়িজন উপস্থিত থাকত। কুড়িজনের মধ্যে অন্তত পনেরোজন আমাদের দুজনকে আলাদাভাবে বিবেচনা করতে শুরু করেছিল। এই বিবেচনার ফলে ব্যবহারিক দিক থেকে আমাকে আর ভূপালীকে মাঝে মাঝে অসুবিধের মধ্যে পড়তে হত। যেমন, এক যুবতী অধ্যাপিকা যাঁর গায়ে তখনও ছাত্রজীবনের গন্ধ পাওয়া যেত, তাঁর ক্লাসে কোনো কারণে আমাদের দুজনের একজনও কোনো একদিন উপস্থিত না থাকতে পারলে প্রায় সংকটের সৃষ্টি হত। তিনি ভারতীয় অর্থনীতি পড়ানোর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। কিন্তু পড়ানোর থেকে লেখানোর কাজে তাঁর উৎসাহ ছিল অক্লান্ত। তিনি ক্লাসে এসে তাঁর ফাইল থেকে হলুদ হয়ে যাওয়া সব সংবাদপত্র বের করে এক একদিন এক এক অংশ থেমে থেমে জোরে জোরে পড়ে যেতেন। আর আমাদের কাজ ছিল তার সমস্ত উচ্চারণকে খাতায় তুলে তুলে রাখা। যেদিন আমি ক্লাসে আছি ভূপালী নেই, তাঁর এমন দিনের উচ্চারণগুলি ভূপালী আমার কাছে থেকে সংগ্রহ করত। ভূপালী ক্লাসে আছে আমি নেই, তাঁর এমন দিনের উচ্চারণগুলি আমি ভূপালীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতাম। কিন্তু ভূপালী নেই আমিও নেই, তাঁর এমন দিনের উচ্চারণগুলি কার কাছ থেকে সংগ্রহ করে নেওয়া যায় এমন এক চিন্তা আমাদের দুজনকেই বিব্রত করে দিয়ে যেত। যার কাছেই খাতা চাইতে যেতাম তার চোখ-মুখের ভাবে পবিত্রতার অভাব দেখে আমরা বিস্মিত হতাম। এমনই এক বিস্ময়ের পরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে ভূপালী বলেছিল—তুমি একবার সন্ধ্যের দিকে যদি আসতে পার ভালো হয়। খুব ভালো হয়। আজ আসবে?

গিয়েছিলাম সন্ধ্যের দিকে। এর আগে কিন্তু সন্ধ্যের দিকে কখনও

যাইনি। এর আগের সমস্ত যাওয়াগুলিই ছিল, দুপুর ঠিক শেষ হয়নি এবং বিকেলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা দুপুরের লেশমাত্র নেই এবং বিকেল আছে পূর্ণমাত্রায়, এমন সব সময়ে। সেই যাওয়াগুলির মধ্যে কখনও থাকত আমার একক অগ্রগতি এবং অদর্শনজনিত ভাবনা—ভূপালী আজ ক্লাসে এল না কেন? কখনও থাকত ভূপালী এবং আমার সমবেত অগ্রসরণ এবং ভূপালীর আশ্বাস,—আমার গতদিনের না আসার ফলে কোনো ক্ষতি হয়নি, ভূপালী ঘর থেকে তার খাতা এনে আমাকে দিয়ে দেবে—এই মর্মে যা বিধৃত। এইসব যাওয়াগুলির ফলে আমার কোনো দেরি হত না। আমি আগেই বাড়ি ফিরে আসতে পারতাম। কিন্তু—সন্ধ্যের পরেই ভূপালীর কাছে যাবার কথা ওঠায় আমার প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছিল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ঠিক করে ফেললাম, এখন বাড়ি ফিরে যাব এবং বিশ্রাম ও জলখাবার গ্রহণের পর হাঁটতে হাঁটতে লম্বা জলক্ষেত্র ও গাছগাছালির মধ্য দিয়ে আবার ফিরে আসব। যেখানে আমাদের ক্লাসগুলি হত তার খুব কাছে থাকত ভূপালী। শোনা যায়, আজ থেকে একশো বছর আগে কেউ কেউ মুগ্ধ শ্রোতাদের যে সমুদ্র তার শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারতেন তাঁদের বক্তব্য এবং তার জন্য খালি গলাই যথেষ্ট ছিল। বিশ্বাস করি সেই সব জলদগম্ভীর স্বর দ্বারা কলেজের বারান্দা থেকে 'ভূপালী' বলে ডেকে উঠলে ভূপালী তা তার ঘরে বসেই শুনতে পেয়ে যেত। ভূপালীর ঘরে ভূপালী একা থাকত না। তার থেকে কিছু ছোটো এবং তার থেকে কিছু বড়ো মেয়েরা তার ঘরে এবং ঘরে-ঘরে থাকত। সমগ্র যুবতীদের যিনি নজরে রাখতেন তিনি গতযৌবন হলেও অধ্যাপিকা ছিলেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে আমার অস্বস্তি হত প্রত্যহ। ভূপালীকে বলে রেখেছিলাম যাব, তবে সন্ধ্যের দিকে তুমি হস্টেলের সামনে পায়চারি কোরো।—সে কথা রেখেছিল। আমি কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেছি বাসে এবং বাড়ি থেকে আবার কলেজে গেছি প্রায় এক ঘন্টা ধরে হেঁটে হেঁটে। লোক কোনো-দিনও আমার মাইল মাইল হেঁটে যাওয়াকে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে

পারেনি। তারা বলে এসেছে—এভাবে তুমি সময় নষ্ট কর কেন?—আমি বলে এসেছি—সময়কে কীভাবে রক্ষা করতে হয় তা জানিয়ে দিতে পারে এমন কোনো মানুষের সঙ্গে আমার আজও দেখা হয়নি। তাই আমার হাঁটার বিরাম নেই। ভূপালী তার ভূমিকাটুকু পালন করে চলে গেছে। কিন্তু আমি আজও মাইলের পর মাইল একা একা অতিক্রম করি।

সন্ধ্যের ছাত্রীনিবাসে কোনো বন্দনাগান শোনা ভাগ্যের ব্যাপার। ভূপালীকে রকে বসে থাকতে দেখে স্বস্তি পেয়েছিলাম। সে আমাকে দেখে উঠে এল—চলো ঘাটের দিকে যাই।—প্রায় বিস্ময়ের মতো বড়ো হয়ে কলেজ গণ্ডীর মধ্যে জলাশয় ছিল। তা ব্যবহার যারা করতে চায় তাদের জন্য সুঠাম সোপান ছিল। সোপানের পাশে ছিল বড়ো দুটি প্রসারণ যেখানে বসে কেউ কেউ সেরে নিত ব্যক্তিগত কথাবার্তা। সেখানে যাবার আগে আমি জানতে চেয়েছিলাম কে বন্দনাগান করছে। ভূপালী আমাকে অনুমানশক্তি প্রয়োগ করতে বলেছিল। ফলে আমি ওর যত নিবাসবন্ধু আমার চেনা প্রত্যেকের নাম পরিষ্কার করে উচ্চারণ করে যেতে পেরেছিলাম। মনে পড়ে, যেসব মেয়ে বহু দূর থেকে পড়তে এসে কলেজের কোলে থেকে যায়, তাদের সব নাম উচ্চারণ করতে করতে আমি প্রায় দেশকালের একটি নীল দীপশিখার স্পর্শ পেয়েছিলাম।—তোমার কোনও নামই মিলল না। শেষ চেষ্টা করবে নাকি?

—হ্যাঁ। বলব? আমার মনে হচ্ছে কোনো রেকর্ড বাজছিল।

—ধ্যেত, হয়নি। তবে শোনো, তুমি যাকে ভয় পাও সেই সুপারের গলা। হল তো?

যেখান থেকে সোপান নেমে গেছে আমরা সেখানেই মুখোমুখি হয়েছিলাম।

—শোনো, তোমাকে যেজন্য ডেকেছিলাম। স্বরকে যে ডাচ সংগীত শোনালে তার পটভূমি সম্পর্কে কিছু জান? আমার মনে হয় সুরটার মধ্যে একটা মুক্তির ভাব আছে, তাই না?

বহুদিন আগের ব্যাপার। সব তো ঠিক ঠিক মনে নেই। তবে এটা

জানি ওলন্দাজ মাঝিদের গলায় সুরটা শোনা যেত। তোমার ভালো লেগেছে?

—খুব ভালো লেগেছে। তুমি তো বাড়ি গিয়ে তরতাজা হয়ে এসেছ। এইজন্যই তো সন্ধ্যেবেলায় আসতে বলেছিলাম। আমাকে একটু সুরটা তুলে দিতে হবে।

—তুমি খেপেছ? স্যর অতবার করে বলাতে একবার পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করার চেষ্টা করেছিল। তাই বলে বারবার! শেষে হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

—ঠিক আছে, নালীক, আমি তোমাকে সাহায্য করছি। তুমি ক্লাসে যা করেছিলে আমি সেটা করার চেষ্টা করছি। তুমি শুনে বলো ঠিক হচ্ছে কি না। যদি ঠিক না হয় তখন তুমি কিন্তু করে দেখিয়ে দেবে।

ভূপালী সেদিন যে সুর শুনিয়েছিল তা নিশ্চয়ই আমার অনুকরণ ছিল না। কিন্তু শিক্ষকের সামনে করা আমার দুর্বল প্রচেষ্টার যেটুকু স্বার্থকতা, তার সূত্র ধরে সে পৌঁছে গিয়েছিল তার একান্ত আপন যে দীপ্তি তার মধ্যে। বলা বাহুল্য এই প্রাপ্তির আনন্দে আমি মিথ্যেকে বরণ করে বলতে পেরেছি—একবার শুনে কী করে তুললে তুমি তাই ভাবছি। হুবহু মিলে গেছে। কোনো খুঁত নেই। সুরের পর্ব শেষ হলে আমরা হাঁটতে হাঁটতে বাস-রাস্তার দিকে যাচ্ছিলাম। দোতলা বাসের ঊর্ধ্বভাগ দেখা যাচ্ছিল। দোতলা বাসের পেছনে দোতলা বাস। তার পেছনে দোতলা বাস ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। ভূপালী হঠাৎ বলেছিল—নালীক, আর-একটা কথা। খুব ছোট্ট করে আমরা একটা পত্রিকা বের করব। তুমি লেখার দিকটা দেখবে, আমি টাকার দিকটা দেখব। বাবাকে আজ রাতেই চিঠি লিখব।

ভূপালীর কাছ থেকে জেনেছিলাম তার বাবা স্বহস্তে গোলাপের চাষ করতেন। জোনাকির বদলে 'খদ্যোত' শব্দটি ব্যবহার করে তৃপ্তি পেতেন। তাঁর রাত্রিগুলি ছিল জ্যোতিষচর্চায় পূর্ণ। আমি জানি না আমার জন্মসময় কতখানি সঠিক, যদিও বলা হয়ে থাকে মার প্রসববেদনা শুরু হবার

পরেই তাঁর কাছে এনে রাখা হয়েছিল ঘড়ি। ভূপালীর অনুরোধে আমি মার কাছ থেকে যে জন্মসময় পাই তা পেয়ে সে তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তার বাবা আমার সম্পর্কে তার কাছে কী কী লিখেছিলেন জানি না। শুধু জানি ভূপালীর উচ্ছ্বাস।—জান নালীক, একটা মজার কাণ্ড ঘটেছে। তোমার রাশি-লগ্ন-নক্ষত্র যা হয়েছে তার সঙ্গে আমার রাশি-লগ্ন-নক্ষত্র একেবারে মিলে গেছে। আমার বৃশ্চিক রাশি, মিথুন লগ্ন, অনুরাধা নক্ষত্র। তোমারও বৃশ্চিক রাশি, মিথুন লগ্ন, অনুরাধা নক্ষত্র।

—তাতে কী হয়?

—তাতে দুজনকেই একটু সাবধানে থাকতে হয়। বাবাও সেরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন এ কথা বলার পরে ভূপালীর ঈষৎ হাসি কী যে বিশদ হয়ে উঠেছিল তা কেবল জানে যৌবন। কিন্তু জেনেছিল প্রত্যেকে, আমাদের ভাঁজ-করা একফালি পত্রিকাটির সমস্ত ব্যয়ভার ভূপালী ছাড়া অন্য কেউ বহন করেনি। সেই দীন পত্রিকার সূত্র ধরে আমাদের যেসব অধ্যাপক কবি ছিলেন তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর শক্তি পেয়েছিলাম। তাঁদের কেউ কেউ কবিতার সঙ্গে দিয়েছিলেন আগামী বন্ধুত্বের অবকাশ। কেউ কেউ পত্রিকার দীনতা দেখে চেতনাকে নামিয়ে এনে যা কিছু দেবার চেষ্টা করেছিলেন তা বড়োজোর কবির সৌজন্য; কবিতা যে নয় তা অবসরে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়া দিত ভূপালী। আর আমরা অঙ্গীকার করতাম সৌজন্যপ্রেমীদের কাছে আর কখনও যাব না।

ছাত্রীনিবাসের পাশেই ছিল অতিথিভবন। নানা রঙের অতিথিরা নানা সূত্রে তার ঘরে ঘরে কদিনের জন্য নিবিষ্ট হতেন। একবার একজন এলেন ভিয়েনা থেকে। তাঁর বড়ো মেয়ের বয়স আটত্রিশ এবং ছোটো মেয়ে যে তখন চৌত্রিশে ছিল তাঁরই বিবৃতি থেকে তা জানতে পেরে-ছিলাম। তাঁকে তাঁর বয়স জিজ্ঞেস করলে তিনি এই বিবৃতি দিতেন। আমাদের ভাঁজ-করা পত্রিকাটি কারও মাধ্যমে তাঁর হাতে পৌঁছেছিল। তিনি বাংলা জানতেন না, কিন্তু বাংলা বিভাগের এক অধ্যাপকের কাছে

আমার খোঁজ করলে আমি একদিন সন্ধ্যের পর অতিথিভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলে যাই। অতিথিভবন সাধারণত সুশান্ত থাকত। আর সন্ধ্যের পরে হয়ে যেত একেবারে মনুষ্যরবশূন্য। প্রথমদিন দোতলায় উঠে বুঝতে পেরেছিলাম এক-একটা ঘর ভিতর থেকে রুদ্ধ আর প্রজ্বলিত হলেও কী আশ্চর্য শ্রম আর মগ্নতার মধ্যে আছে। ভয়ে ভয়ে একটির পর একটি দরজার সামনে উঁকি মেরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। দরজার ওপরে আমি যে সংখ্যাটি চাইছিলাম তা ছিল একেবারে শেষে। শেষ দরজায় করাঘাত করলে দরজা খুলে যেতে একটু সময় নিয়েছিল। মুক্ত দরজার সামনে যিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁর নীচের দিকে একটা ছোটো প্যান্ট, আর ওপরের দিকটা দেখে বোঝা যাচ্ছিল করাঘাতের পর তাকে কোনোমতে আবৃত করা হয়েছে। আমি তাঁর আহ্বানে উপবিষ্ট হলে তিনি পুনঃপুন জানিয়েছিলেন আমাদের গ্রীষ্ম তাঁকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি জামা খুলে ফেলে উর্ধ্ব অনাবৃত রাখলে আমি যেন কিছু মনে না করি। সেই দীর্ঘদেহী ভিয়েনাপুরুষ একসময় শুধুমাত্র ছোটো প্যান্ট শরীরে রেখে আমাকে ঠাণ্ডা কফি করে দিয়েছিলেন। আমার কাপে নয়, তাঁর নিজের কাপে চামচের পর চামচ চিনি ঢালতে দেখে তাঁকে প্রশ্ন করে-ছিলাম, এত চিনি কি বহুমূত্ররোগ নিয়ে আসে না? তাঁর জবাবে দৃঢ়তা ছিল। তিনি বলেছিলেন, চিনি বহুমূত্র আনে এ কথা ঠিক নয়, তবে বহুমূত্র এসে গেলে চিনি নিষিদ্ধ। অপর্ণা এবার যে সমুদ্রতটে গেছে তার থেকে একটু দূরে এমন একটা পথ আছে যার দুধারে যারা বসে বসে ভিক্ষে চায় কিংবা রিকশার সঙ্গে দৌড়তে থাকে যারা ভিক্ষে পাবার আশায়, তাদের অনেকেরই হাতে পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো এবং কেউ কেউ হারিয়েছে একাধিক আঙুল। যতবারই সেই পথ দিয়ে গেছি ততবারই এমন এক ভয় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অঙ্গ-হারানো সব দৃষ্টি। এই পুরুষ ভিয়েনা থেকে একটু দূরে সেইসব দৃষ্টির মধ্যে কাজ করতে করতে অর্জন করেছেন চিকিৎসক হিসেবে এমন সুনাম যা শুধু আর আঞ্চলিক থাকতে পারেনি। তিনি অতিথিভবনে

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে এসে আমার মতো আর্বচীনকেও বাদ দেননি। প্রথম দিনই আমাকে স্মৃতি থেকে স্বরচিত কবিতা বলতে হয়েছিল। আর তিনি একটা জটিল টেপ চালিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি তাঁর ঘর থেকে বেরোলে ঘর আবার ভিতর থেকে রুদ্ধ হল। আর তখনই সমস্ত রুদ্ধ এবং প্রজ্বলিত ঘরের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বাঁদিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছিলাম। বাঁদিকে ছাত্রীনিবাসের একটি অংশ জ্বলজ্বল করছে। সেখানে বহু জানলা তখনও উন্মোচিত হয়ে আছে। তারই একটা জানলার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ভূপালী ঘরের মধ্যে আমার দিকে পিছন রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ধ্বনিগরিমার অজানা শক্তি আমার গলায় নিয়ে এসে একবার 'ভূপালী'—এই ডাক ছাড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু সম্ভব হয়নি ডাকা। কারণ সারি সারি সারস্বত যে নীরবতা তার মধ্যে এমন একটা নিষেধ ছিল যা আমি শুনতে পেয়ে যাই। আমাদের কলেজ-জীবনের একেবারে শেষ দিকটাতে আসন্ন পরীক্ষার দিকে তাকিয়ে বিভাগীয় প্রধান মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে তাঁর বাড়ি যাবার জন্য বলেছিলেন। আমরা যেতাম। তাঁর বাড়ি, আমার বাড়ি কিংবা ভূপালীর নিবাস থেকে একেবারে অন্য দিকে ছিল। দুজনের পক্ষে সুবিধেজনক একটা জায়গায় মিলিত হয়ে হাঁটতে শুরু করতাম। বেশ খানিকটা হাঁটতে হত আমাদের। এই সময়ে ভূপালীকে অনেক কিছু বলার ইচ্ছে হত। কিন্তু আমাদের বাড়ির কথা ভেবে কোনো কথাই বলার মতো উৎসাহ কোনোদিক থেকে পেতাম না। বাবা বাজার যাবার সময় এবং বাজার থেকে ফিরে এসে থলি হাতে করে অবিশ্বাসের সঞ্চার করতেন। আর বুবুন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে। আর নোনাধরা দেয়াল থেকে অবিরাম বালি ঝরছে এবং মেঝেতে বিছানা পড়ছে অপরিণত রাতে। পড়ানোর কাজটুকু হয়ে গেলে বিভাগীয় প্রধান বহু প্রসঙ্গে চলে গিয়ে অন্তত কিছু সময় আমাদের উপহার দিতেন যা বেশ ব্যক্তিগত ছিল। তিনি একদিন এমন কি বুদ্ধের কথা বলেছিলেন। অতিশয় বড়ো একটি ঘরের উজ্জ্বল সব গ্রন্থস্তম্ভ আমাদের

পরিপার্শ্বরূপে বিরাজ করত। বিরাজমান সব সম্পদের দ্বারা তাঁর চশমা-বিযুক্ত চোখ মাঝে মাঝে তাঁর বক্তব্যের সহায়ক শক্তি ছিল। তিনি তেমন কোনো সময়ে বলেছিলেন—বুদ্ধ নাস্তিক এমন একটা কথা পণ্ডিতরা চালু করে দিয়েছেন। আসলে দেখা গেছে তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে নীরব ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সময়ে যে পরিস্থিতি ছিল সেখানে ঈশ্বর সম্পর্কে বলতে যাওয়া পণ্ডশ্রম।

ভূপালী আমাদের পরীক্ষার ঠিক আগে বিভাগীয় প্রধানের বাড়ি থেকে ফেরার পথে একদিন আমার হাত ধরে জানিয়েছিল—তোমার মতো বন্ধু পেয়ে আমি ধন্য, নালীক।—এর পরেই সে অতিকষ্টে তার বক্তব্য রেখে যায় এবং আমি জানতে পারি তার ফেরার অপেক্ষায় বসে আছে এক উজ্জ্বল বিমানকর্মী। পরীক্ষা শেষ হলেই তার বাবা তাকে সেই তরুণ চিকিৎসকের হাতে তুলে দেবার কাজটি মিটিয়ে ফেলবেন। আমি মাথা সোজা রেখে সব কিছু শুনেছিলাম, পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং পেয়েছিলাম মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে ভূপালীর সমবেদনা। কিন্তু পাইনি এমন কোনো পথ যা অতীতের পদশব্দদ্বারা অধ্যুষিত না হয়ে ভবিষ্যতের দিকে চলে গেছে সরাসরি।

পড়াশুনোর সরকারি পর্ব শেষ হবার আগেই সেতুবন্ধনের অফিস থেকে বাবা অবসরজীবনের মধ্যে এসে পড়েছিলেন। প্রচলিত অর্থে কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে ভাবগত এবং ভৌগোলিক সব দূরত্ব থাকে আমাদের সেসব দূরত্ব পার হতে হয়নি। আমরা একই বাড়িতে বসে একই শিক্ষকসঙ্ঘের তাপ নিয়ে একদিন স্নাতক থেকে স্নাতকোত্তরে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এর পরে কোথায় যাব তা জানতে আমার রাতের পর রাত কেটে গেছে। মাঝে মাঝে লোভনীয় পদের জন্য লিখিত পরীক্ষায় বসার চিঠি পেতাম দূর দূর থেকে। কিন্তু আমি বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম এই শহরের বাইরে কোথাও চলে গিয়ে দাঁড়ানোর মতো যোগ্যতা আমার নেই। চার বর্গমাইল জুড়ে আমার যে মানচিত্র তাকে বিচলিত করার মতো সাহস আমার ছিল না। আমি দূর দূর থেকে আসা

লিখিত পরীক্ষার খামগুলিকে বাবার চোখে যাতে না পড়ে এমন কোনো জায়গায় সরিয়ে রাখতাম। একবার এমন একটা চিঠি এল যা ছুটে গিয়ে বাবার চোখের সামনে ধরা যায় এবং চিঠিটি এসেছে আমার শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে। এক রবিবার সকালে এই চিঠির শক্তিতে বোধহয় শহরের সবচেয়ে উঁচু বাড়িটার সামনে উপস্থিত হলাম। বিশাল একটা লাইন অপেক্ষা করছিল। কয়েকটি লিফট ক্রমাগত সচল থেকে লাইন থেকে তুলে আনা পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ তলায় পৌঁছে দিচ্ছিল। সবাই সবচেয়ে ওপরে পৌঁছলে মাইকে বলে দেওয়া হয়েছিল কী করতে হবে এই পরীক্ষায়। এই পরীক্ষায় 'শুরু করো' বললে সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করতে হবে এবং 'থামো' বললে সঙ্গে সঙ্গে থেমে যেতে হবে, কাজ তখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন। 'শুরু করো' এবং 'থামো'—এই দুটি নির্দেশ মাইকে ঘোষিত হয়েছিল ইংরেজির মাধ্যমে। এই পরীক্ষাটির মুখোমুখি হয়ে আমি হলঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম সবাই দম নিয়ে প্রস্তুত এবং বাঁশি বাজলেই শুরু হবে দৌড়। ওই গতিময় প্রেক্ষা-পটে 'শুরু করো' এই নির্দেশ বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার শুরু আসেনি। দৌড়ে গিয়ে সাধারণত যেসব ফিতে ছোঁয়া হয়ে থাকে তার কোনোটিরই রঙ আমি চোখের সামনে আনতে পারছিলাম না। ফলে আমার যেটুকু করে যাবার তা করে যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 'থামো' বলার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গিয়ে পরিদর্শকের হাতে খাতা তুলে দিয়ে দেখি চারপাশের অনেকেই যাঁরা যাঁরা খাতা নিয়ে নেবেন তাঁদের শৈথিল্যের সুযোগ নিয়ে তখনও চলছে। বাড়ি ফিরে এসে বাবাকে বলেছিলাম—সফল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।—কিন্তু কয়েক মাস বাদে আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে চিঠি এল—তুমি নির্বাচিত হয়েছ। তোমাকে এবার ডাক্তারের সামনে উপস্থিত হতে হবে, দুপুরবেলায়, ওই একই বাড়িতে।

ডাক্তার তাঁর ঘর থেকে দূরে গির্জার যে বড়ো ঘড়িটি দেখা যায় আমাকে তার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি চশমার কাঁচ ভালো

করে মুছে নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতে যাব, এমন মুহূর্তে স্বহস্তে জানলা প্রসারিত করে দিয়ে তিনি আমাকে ভালো করে দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই দূরের ঘড়ি আমার কাছে তখনও ঝাপসা ছিল। 'বলুন বলুন কটা বাজে'—এই কথাটা বলতে বলতে ডাক্তার ঘরের অন্যদিকে চলে গিয়ে পরবর্তী কোনো পরীক্ষার ব্যাপারে ঝুঁকে পড়েছিলেন। এই সরে যাওয়াটাকে অপ্রত্যাশিত সুযোগ মনে করে আমি আমার মণিবন্ধে বাঁধা ঘড়ি থেকে সময় দেখে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি আমার ওজন নিয়েছিলেন। আমি যখন ওজন-যন্ত্র থেকে নেমে দাঁড়ালাম তাঁর বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছিল—কী ব্যাপার, কী খাওয়াদাওয়া করেন? তিনি বিস্ময়ের ঘোর প্রায় বজায় রেখেই আমাকে বলে উঠলেন—একটু প্যান্ট খুলুন—এ-কথা বলার পর ঘরের অন্যদিকে কোনো কিছু নিয়ে আসার জন্য তিনি সরে গেলে আমি জীবনের অন্যতম বড়ো এক অসহায়তার স্বাদ পেয়েছিলাম। কেবলই মনে হচ্ছিল ভূপালী বিমানবন্দরের বিরাট চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে চলে না গেলে আমি কখনোই এই পরীক্ষার মুখোমুখি হতাম না। তিনি একটি বড়ো চামচ নিয়ে আবার আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন—কী হল? প্যান্ট খুলুন, লজ্জার কী আছে।—প্রায় কান্নার মতো ধীরে তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। তিনি পরবর্তী অন্তর্বাসও উন্মোচন করার কথা বলেছিলেন। সেটিও বন্ধনমুক্ত হলে সেই বড়ো চামচ দিয়ে আমার অত্যন্ত ব্যক্তিগত দুটি গোলাকার স্থিতি ছুঁয়ে রেখে সরব হয়েছিলেন—ভালো করে জোরে জোরে কাশুন তো।—আমি তাঁর শেষ নির্দেশ পালন করে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম তখন একটিই সংকল্প ছিল। বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে, এবং চৌবাচ্চা ভরে উঠবে একেবারে নতুন জলে। আমি সেই নতুন জলের পাশে দাঁড়িয়ে আবার স্নান করব।

নিয়োগপত্র নিয়ে কোন বাড়িতে যাব সেটা আমার একটা দুশ্চিন্তা ছিল। কারণ যে বহুতল বাড়িটিতে লিখিত মৌখিক ও শারীরিক পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম তার অধীনে দেশের প্রায় সর্বত্র শত শত

বাড়ি আছে। আমি শেষ পর্যন্ত এমন একটা বাড়িতে গিয়ে বসার নির্দেশ পেলাম যা আমার বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। এই শাখা অফিসের তলায় বাজার আছে। এই শাখা অফিসের মধ্যেও যে-সমস্ত কাজ হয়ে থাকে তার মধ্যে বাজারের সমস্ত লক্ষণগুলি আছে। এই অঞ্চলের বহু মানুষ আমাদের কাছে তাঁদের টাকা জমা রেখে চলে যান। আমরা তার জন্য তাঁদের সুদ দিয়ে থাকি। তাঁদের সঞ্চিত টাকা থেকে টাকা নিয়ে আমরা আবার অনেককে টাকা ধার দিয়ে থাকি এবং তার জন্য যে সুদ পাই তা নিঃসন্দেহে আমরা যে সুদ দিয়ে থাকি তার থেকে অনেক বেশি। প্রথমে ঋণী হওয়া আর তারপর ঋণী করা। এই ঋণী হওয়া আর ঋণী করার খেলা দেখতে দেখতে বহু বছর এখানে কেটে গেল। তবে অফিসটা বাড়ির খুব কাছে হওয়াতে প্রয়োজনে যখন-তখন যে-কেউ চলে আসতে পারে। এই তো সেদিন অপর্ণা এসেছিল জয়ের হাত ধরে। আমি কাউন্টারে বসে যে-কোনো মানুষের অপেক্ষা করছিলাম। অপর্ণা কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল। তার মুখে একটু লজ্জার ভাব ছিল।—কী ব্যাপার, তুমি ?

—মাম্পি প্রচণ্ড বায়না ধরেছে, আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চলো, বাবাকে দেখব! ভোলানোর অনেক চেষ্টা করেছি। কিছুতেই ভোলাতে না পেরে নিয়ে এসেছি।

—কই, মাম্পি কোথায় ? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।

অপর্ণা হেসে উঠল।—মাম্পিও তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই না মাম্পি ?

অপর্ণা কাউন্টারের সানুদেশ থেকে এবার ওকে কোলে তুলে নিলে আমরা একে অপরকে দেখতে পেলাম।—হল তো, বাবাকে দেখলে। এবার বাড়ি চলো।

কিন্তু জয় তখনই চলে যেতে রাজি নয়। সে কাউন্টার পার হয়ে আমার কাছে চলে আসতে চায়। এই অবস্থা সামলে নিতে আমি আমার জায়গা থেকে উঠে পড়ে পেছন দিয়ে ঘুরে অপর্ণার কাছে গিয়ে জয়কে

কোলে তুলে নিই। কিন্তু সে কিছুতেই বাড়ি যাবে না। তার আসল কথা, সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে তবে বাড়ি যাবে। শিশুদের ভয় দিতে ইচ্ছে করে না। অনিচ্ছার সঙ্গে আমি ওকে কোলে করে অফিসের পাহারায় যে নিযুক্ত আছে তার চেয়ারের কাছে চলে গিয়েছিলাম। তার বন্দুক আর পোশাক জয়কে দেখিয়ে বলেছিলাম—তুমি যদি মার সঙ্গে বাড়ি না যাও ওকে দেখছ তো, ও তোমাকে ধরে নিয়ে আটকে রেখে দেবে। ওর বন্দুক আছে। আমি তো আর ওর কাছে যেতে পারব না। তখন তুমি কী করবে? তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও।

জয় আর দেরি না করে মার হাত ধরে বাড়ির দিকে রওনা হলে সশস্ত্র ছেলেটি হেসে উঠে আমাকে বলল—নালীকবাবু, আমি তো ঘুরে এলাম। কাল ফিরেছি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তো সেই পরিক্রমায় গিয়েছিলে। সব ভালোভাবে হয়েছে তো?

—অতি চমৎকার ভাবে হয়েছে। কোনো অসুবিধে হয়নি। পরে আপনাকে সব বলব।

এই ছেলেটি চুরাশি ক্রোশ বৃন্দাবন পরিক্রমায় যোগদান করেছিল। কোনো ভাবেই যাতে ছুটির অসুবিধে না হয় তার জন্য সে বহু আগে থেকে অফিসের ছুটির জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়ে রেখেছিল। মাঝে মাঝে বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে সে কারও কারও কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কোনো কোনো প্রসঙ্গ তুলে কিছু কথা বলতে চায়। আমি হয়তো কাজ করছি, খুব একটা চাপ নেই, কথা বলার মতো অবকাশের তেমন একটা অভাব নেই, সে বসে বসে সব লক্ষ্য করে আমার ডান পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার বন্দুকটাকে একটু কাঁধ বদল করে ঝুলিয়ে নিল।—নালীকবাবু, আজ লক্ষ্মীবার। লোক কম, দেখেছেন তো? ওঃ, ভালো কথা। আমার গুরুভাইয়ের কাছে আপনি যে বইয়ের কথা বলেছিলেন তা নেই। তবে বিষ্ণুপুরাণ আছে, তাতে চলবে?

—ঠিক আছে সুধীর, যদি দরকার হয় তোমাকে জানাব। তারপর

কেমন আছ ? অফিস থেকে বাড়িতে গিয়ে কী কর ?

—বাড়ি যেতে যেতেই তো সন্ধ্যে হয়ে যায়। তারপর একটু বিশ্রাম করে দু-তিন বালতি জল টানি। আমার আবার পাম্প করতে যত কষ্টই হোক ওই সময় একবার স্নান না করলে চলে না। তারপর চা-টা খেয়ে কোনো কোনোদিন বাজারে যাই। বাজার যেদিন না যেতে হয় সেদিন একটু বউকে নিয়ে বসি।

লক্ষ্য করি, এর পরেই সে একটু চুপ করে এবং সামান্য লজ্জায়, হাসিতে দাঁড়ায়।

—বসে কী কর ? চুপ করে আছ যে ?

—আপনাকে বলা হয়নি, কিছুদিন আগে একটা পুরনো শ্রীখোল কিনেছি। তাই সময় পেলে বউকে নিয়ে বসে একটু নাম করি।

অফিসে মাঝে মাঝে বিভিন্ন সূত্রে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার থাকে। যেমন কারো উন্নতি হল। সে চলে যাবার আগে যে টাকা হাসিমুখে দিল তাতে প্রত্যেকেরই পেট ভরে খাওয়া হয়ে যায়। এখানকার অধিকাংশ কর্মচারী পেট ভরে খাওয়া বলতে মাংস-ভাত খাওয়াকেই সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক ব্যাপার মনে করে। যখন এই খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয় তখন নিরামিষাশীদের জন্য পাঁচ-ছটি ঠোঙায় মিষ্টির বন্দোবস্ত থাকে। একটি ঠোঙা অবধারিতভাবে সুধীরের হাতে যে তুলে দিতে হবে, এ সকলেরই জানা। আমি নিজে আরও কিছু জানতে পারলাম এবারের অফিস পিকনিকে উপস্থিত থেকে। অফিসের কাছে ঋণী এমন একজনের নতুন বাস নিয়ে যাত্রার কথা ভাবা হয়েছিল। এক ছুটির সকালে বেশ বেলায় যেখানে গিয়ে পৌঁছনো হল তার অনতিদূরে গঙ্গা উদার। যে বাড়িটায় ওঠা হয়েছিল সেই বাগানবাড়ির মালিকের কাছে অফিস ঋণী ছিল। মালিক ভদ্রলোক তাঁর অফিস ছুটি নিয়ে আগের দিন বাগানবাড়িতে চলে যান। আমাদের যাতে কোনো অসুবিধে না হয় তার জন্য সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রান্নার কাঠ আর জলের সঞ্চয় রেখে পরের দিন সকাল থেকে আমাদের অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন সহাস্যে। বাস

থামলে জলখাবারের পর্ব শেষ করে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে বেশ কয়েকজন গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মূল রান্না যখন প্রায় শেষ তখন তাদের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল বিশিষ্ট সব বোতল পাশে রেখে কেউ কেউ গান গাইছে, কেউ কেউ অফুরন্ত মনোবেদনায় কাঁদছে, থম মেরে আছে কেউ কেউ, আর কেউ কেউ বমিতে ভাসছে। এই শেষের দলটিতে যারা ছিল তাদের প্রত্যেককেই ধরে ধরে রন্ধনক্ষেত্রের দিকে নিয়ে আসতে হয়েছিল। আমি যার চোখেমুখে জল দিয়ে যাকে তুলে দাঁড় করিয়েছিলাম, যাকে ধরে ধরে নিয়ে এসেছিলাম আগুনের খুব কাছে এবং এই নিয়ে আসার পর্বে যার জন্য আমিও নিজেকে কম অসহায় মনে করিনি সে সুধীর আনখশির।

শুধু সুধীরকে কেন, এমন দিন প্রতি সপ্তাহেই অন্তত একবার আসে যখন নিজেকেই ধরে ধরে এনে অফিসের চেয়ারে বসিয়ে না দিলে চলে না। সাধারণত এসব দিনগুলি সোমবার হয়ে পড়ে। শনিবার অর্ধেক অফিস করে অফিস ছাড়ার পর শনিবারের বেশ কিছুটা এবং রবিবারের পুরোটা মিলে এমন একটা স্বেচ্ছাচারের মধ্যে চলে যায় যে তার প্রভাব সোমবার সকালে দূরে ঠেলে দিয়ে হাসতে হাসতে এসে কাজে যোগ দেওয়া আমার মতো দুর্বলচেতার পক্ষে আর সহজ থাকে না। সহজ থাকে না শব্দের যে মহা মিশ্রণ ঘটতে থাকে তাকে তুচ্ছ করার কাজ। বিদ্যুৎ না থাকলে সিঁড়ির নীচে যে কালো বস্তুটি বসানো আছে তাকে জাগিয়ে দেওয়া হয় এবং তার সেই গর্জন কাচের দরজার ফাঁক দিয়ে ওপরে উঠে এসে প্রতিটি স্নায়ুকে গ্রাস করতে চায়। সহকর্মীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে কথা বলে। যেখানে জমির দাম এবং অবস্থান নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেখানে যে কারও সাম্প্রতিক সেতারবাদন নিয়ে মতান্তর হবে না এ কথা কে বলল? মতান্তরের শব্দ হয়। যেখানে গান নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেখানে কণ্ঠনালীর অসুখ নিয়ে বাদপ্রতিবাদ ওঠে এবং কণ্ঠনালী থেকে কোনো কোনো রাতের কণ্ঠলগ্নতায় চলে যেতে কে বলল দেরি হয়? দেরি না হবার শব্দ হয়। এইসব শব্দের পাশে তাচ্ছিল্য প্রকাশের শব্দ হয়।

সেই সব শব্দের মধ্যে থাকে যাকে যা শিখিয়ে রাখা হয়েছে তার পরে আর কিছু না থাকার সব ঘোষণা। এ ছাড়াও কিছু কিছু শব্দ আছে যা একটু অন্য রকমের। সেগুলির সৃষ্টি হয় কোনো কোনো বহিরাগতের হঠাৎ এসে পড়ার ফলে। এইসব আকস্মিক শব্দের শক্তি কোনো ভাবেই কম নয়।

যেমন একটি মেয়ে প্যান্টের কাপড় নিয়ে অফিসের একদিকে বসে পড়ে। তার চারদিকে অনেক তরুণ দাঁড়িয়ে যায়। সে কাপড় বের করে যায় একটির পর একটি। কেউ কেউ কোনো কোনো আকর্ষণীয় কাপড় হাতে করে অফিসের চারদিকে দেখিয়ে বেড়ায়, মতামত সংগ্রহ করে এবং তেমন হলে মেয়েটিকে কাপড় আর ফিরিয়ে না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেয়। তারপর তিন-চারটি কিস্তিতে দাম পরিশোধের যে সুযোগ আছে সেই সুযোগের তালিকায় সে মেয়েটিকে দিয়ে তার নাম অন্তর্গত করায়।

যেমন একটি ছেলে, স্বহস্তে চানাচুর বানায় বলে যার খ্যাতি আছে, প্রতিটি টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার ব্যাগ থেকে সবে হয়তো স্বচ্ছ কাগজে মোড়া চানাচুর বের করেছে, এমন সময় পেছন থেকে কেউ জোরে জোরে তার গতদিনের চানাচুরের প্রশংসা বা নিন্দা করতে করতে তার দিকে এগিয়ে আসে। তাকে এগিয়ে যেতে দেখে আর একজন চেয়ার থেকেই বলে উঠতে পারে—আজ বাদাম এনেছ তো? আমাকে বাদাম দেবে। যার কাছে ছেলেটি প্রথম থেমেছিল তার কাছে দাবি রাখার জন্য সমস্বরের অভাব হবে না।—এই যে বিশুদা, একটা প্যাকেট নিয়ে খুলে ফেলুন না। চায়ের আগে এই উপকারটুকু করুন।—যে কোনো বিশুদারই প্রতিরোধক্ষমতা এই একাগ্র দাবির মুখে ভেঙে যেতে বাধ্য। এবং ভেঙে গেলে কেউ না কেউ বিশুদার নামে ছেলেটির হাত থেকে একটি স্বচ্ছ মোড়ক চেয়ে নিয়ে তার মুখ খুলে দিকে দিকে বিলিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

কিংবা দেখা যাচ্ছে না, কাউন্টারের আড়ালে জনতার সঙ্গে মিশে গিয়ে কোথাও বসে আছে এমন কোনো মানুষের অনুকূলে একটি বিবর্ণ

আবেদনপত্র আমাদেরই কেউ প্রত্যেকের চোখের সামনে উপস্থিত করে যাচ্ছে।—"পত্রবাহক মূক ও বধির। এই কঠিন সংসারে তাহাকে দেখিবার মতো কেহ নাই। হৃতভাগ্য আপনাদের কৃপাপ্রার্থী। কৃপাই তাহার একমাত্র সম্বল। অনুগ্রহ করিয়া কিছু সাহায্য করুন।" তখন তাকে খুঁজে বের করে দেখার ধুম পড়ে যায়। কাগজে প্রত্যেকের নাম লিখে তার পাশে অর্থের পরিমাণ লিখে লিখে যাবার জন্য লোকের অভাব হয় না। একদিকে চেয়ার ছেড়ে উঠে উঠে গিয়ে মানুষটিকে দেখে আসা, আর একদিকে যে কাগজ নিয়ে ঘুরছে তাকে অর্থের ব্যাপারে 'হ্যাঁ' বলা বা ঘুরিয়ে 'না' বলার স্বরক্ষেপণ।

কিংবা আমাদের পেছনে আমাদেরই কোনো সহকর্মীর সঙ্গে যে সুদর্শন প্রবীণ কথা বলে যাচ্ছেন তাঁরই লেখা একটি আবেদনপত্র প্রত্যেকের সামনে রাখার কাজটি হয়ে গেল যথাযথভাবে। জানতে পারলাম—"আমি একজন চিত্রশিল্পী। কিছুদিন ধরে আমার ডান হাত অসাড় হয়ে পড়ায় আমি আর কোনো রকম কাজ করতে পারছি না। ফলে নিঃস্ব হয়ে পড়ছি। এই দুঃসময়ে আপনাদের যে কোনো রকম সাহায্য আমার কাছে অমূল্য হবে।" একফালি সাদা কাগজে লিখে লিখে যে অর্থ সংগ্রহ করছিল সে আমার কাছে এলে আমি দেখলাম বেশ কয়েকটি নামের পাশে 'পারছি না' লেখা রয়েছে। যারা 'পারছি না' লিখেছে তাদের কয়েকজন সমবেত হয়ে চিত্রশিল্পীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যে কথাই বলুক তার গুঞ্জনশক্তি আছে।

কিছুদিন ধরে এসব আকস্মিক এবং অনিয়মিত শব্দের পাশাপাশি একটা প্রত্যাশিত তথা নিয়মবদ্ধ শব্দ হয়ে চলেছে। সপ্তাহে একবার যার আসার ব্যাপারে কোনোরকম ছেদ পড়ে না সেই তরুণের কাছে থাকে নানা প্রদেশের লটারির টিকিট। সে এসে পড়লে তার চারদিকে যে ভিড় হয় তা নিশ্ছিদ্র। আগের সপ্তাহে যেসব টিকিট বিক্রি হয়েছে সেগুলির ফলাফল তার নখদর্পণে। মাঝে মাঝে তাকে জোরে বলতে শুনি তার থেকে টিকিট কিনে যে দু-একজন সদ্য ফল পেয়েছে তাদের

অচেনা নাম-ঠিকানা। তার থেকে টিকিট কিনতে কিনতে কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তার যে প্রকাশ হয় তা বড়ো মৃদুলতাময় নয়। কেউ কেউ ক্লান্ত হয়, হতাশ হয় না। তারা একা একা ছোটো ছোটো টিকিট আর না কিনে বড়ো টিকিট কিনতে থাকে দলবদ্ধভাবে। ফলে ফলাফল জানার জন্য যে সাধারণ উৎসাহ, তার সঙ্গে এক দলবদ্ধ এবং অসাধারণ উৎসাহ মিলে প্রায় একটা আলোড়ন হয়ে ওঠে আমারই কোলের কাছে, অখণ্ডে এবং মণ্ডলাকারে। আমি প্রায়ই এই প্রবলতার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে এমন কয়েকটি নীরবতার কথা ভাবতে থাকি যেগুলির মুখো-মুখি হয়ে আমি কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে প্রবল ভাবতে পেরেছিলাম।

অফিসের নীচে একটা ঘড়ির দোকান ছিল। এখন যে ঘড়ির দোকানটা আছে তা সেই আগের দোকানের পরিবর্তিত সত্তা। আগের দোকানের সঙ্গে এখনকার দোকানের গুণগত এবং রূপগত কোনো মিল কেউ খুঁজে পাবে না। শশীদা ছিলেন আগের দোকানের শুধু মালিক নন, প্রাণপুরুষ। তাঁরই কথা ভেবে তাঁরই দিকে তাকিয়ে অঞ্চলের মানুষ তাঁদের যাবতীয় ঘড়ি নিয়ে নিশ্চিন্তে চলে আসতেন। ঘড়ির অনেক সূক্ষ্ম কাজ কেবল কর্মচারীর ওপর ছেড়ে না দিয়ে তিনি নিজে বসে বসে করতেন। শহরতলির বাড়িতে ফিরে যেতে তিনি প্রায় প্রতিদিন শেষ বাসের সাহায্য নিতেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁর দোকানে গিয়ে বসতাম। পুরনো চেহারার সম্ভ্রম-জাগানো সব ঘড়ি দেখতে ভালো লাগত। শশীদা তখন দাড়ি কামানো বন্ধ করে দিয়েছেন। পরিচিত মানুষদের কখনও কখনও বুকে জড়িয়ে ধরছেন। খুবই সূক্ষ্ম কাজ করতে করতে শাণিত আলোর সামনে থেকে উঠে এসে অন্যত্র বসে পড়ে আমাকে বলছেন—নতুন গান লিখেছি, সুরও দিয়েছি, শোনো।—আমার দিকে না তাকিয়ে গানের কথা বলেই গান শুরু করে দিচ্ছেন। তাঁর গান শুনে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারতাম—কোথাও কিছু একটা খুলে যাচ্ছে আর তিনি ছড়িয়ে পড়তে চাইছেন।

একদিন সকালবেলায় আমার অফিসে গিয়ে হাজির হলেন।

—নালীক, তোমার কাছে এলাম। আমার একটা উপকার করতে হবে।

—কী উপকার, শশীদা ?

—তুমি বোধ হয় জান, তোমাদের এই অফিস প্রথম যেদিন খোলা হয় সেদিন আমিই প্রথম অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম। আমার অ্যাকাউন্ট নম্বর এক। তাই এর আগে যখনই অ্যাকাউন্ট বন্ধ করব ভেবে ব্যাঙ্কে এসেছি তোমাদের ম্যানেজার হাত ধরে বাধা দিয়েছেন—এক নম্বর অ্যাকাউন্ট বন্ধ করবেন না। তাঁর অনুরোধে আমি আর বন্ধ করে দিতে পারিনি। কিন্তু আজ আর কোনো অনুরোধ রক্ষে করার ক্ষমতা আমার নেই। আমাকে বন্ধ করতেই হবে। এ বন্ধন আমি আর রাখব না। কী করতে হবে তুমি আমাকে বলে দাও।

আমারও ইচ্ছে ছিল তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এ ব্যাপারে ক্ষান্ত করা। তাঁর গলার স্বর শুনে বুঝতে পেরেছিলাম কোনো লাভ হবে না।

—শশীদা, আমি একটা দরখাস্ত লিখে দিচ্ছি। আপনি তাতে সই করে দিয়ে যাবেন। দশদিন বাদে আপনার প্রাপ্য টাকা পেয়ে যাবেন, আর অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে।

—তুমি আমাকে বাঁচালে। তাহলে দরখাস্ত লিখে দাও, আমি সই করে দিয়ে যাচ্ছি।

তিনি সই করে দিয়ে চলে গেলে আমি একটু পরিণত রাতে বাড়ি থেকে তাঁর দোকানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। পরিণত রাতে যাবার সুবিধে এই যে সন্ধ্যেবেলার লোকজন তখন চলে যেতে থাকে। এমন কি সদ্য-সাবালক কর্মচারীকে তিনি বাড়ি যাবার অনুমতি দিয়ে দেন। সেদিন আমি উপস্থিত হয়েই তাঁকে একা পেয়ে গিয়েছিলাম। তিনি একটা হাতঘড়ি নিয়ে আলোর দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

আমার পদশব্দে তিনি একবার আমাকে দেখে নিয়ে আবার নিবিষ্ট হয়েছিলেন। এই নিবিষ্ট থাকার পর্বটি একেবারে স্বল্পায়ু ছিল না। তখন দেখেছিলাম বহুদিন ধরে পড়ে-থাকা একটা বড়ো ঘড়িতে স্পন্দন শুরু

হয়েছে। ঘড়িটি আমার উলটো দিকের দেয়ালে টাঙানো ছিল।

তিনি কাজ শেষ করে উঠে এলেন। আমাকে একবার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—প্রেমাশ্রু চোখের কোন কোল দিয়ে ঝরে বলো তো?

—কোন কোল দিয়ে? আমি তো জানি না।

—বাঁ চোখের বাঁ কোল দিয়ে আর ডান চোখের ডান কোল দিয়ে।

দোকান বন্ধ করে তিনি আমাকে নিয়ে বাস-রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। পদাতিকের সংখ্যা অত্যন্ত কমে গেছে। গাড়ি যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। যে-কোনো সময় তাঁর বাস এসে পড়বে। তিনি আমার হাত চেপে ধরে সাশ্রুনয়নে মিনতির সুরে বললেন—ভাই, একটা কথা মনে রেখো। কে কোন ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে তা চোখ দিয়ে না দেখে বোধ দিয়ে দেখবে।

অফিসেই সাতসকালে একদিন চলে এল অংশুময়।

—অংশু, তুমি এখন?

—আমার এক পিসিমার কথা তোমাকে তো অনেক বার বলেছি। তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না। নব্বই বছর বয়স হল। এখন যে-কোনো দিন চলে যেতে পারেন। আমি আজ বিকেলের দিকে দেখতে যাব ভাবছি। তুমি যাবে?

—নিশ্চয়ই যাব। তুমি দুপুর দুপুর আমার অফিসে চলে এসো। এখান থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ব।

অংশুময় কয়েকবার আমাকে তার স্বরচিত পিসিমার কাছে নিয়ে যাবার কথা বলেছে। শুনেছি অত্যন্ত অল্প বয়সে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর সমস্ত যৌবন পথে পথে কেটেছে। কোনো এক উচ্চতা থেকে একবার তাঁকে ঠেলে নীচে ফেলে দিয়েছিল কিছু ঈর্ষান্বিত পাণ্ডা। তিনি বেঁচে যান, কিন্তু তাঁর মেরুদণ্ড দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে পিঠের ওপর কুঁজের মতো একটা পিণ্ডের সৃষ্টি করে। আমি সেদিন গিয়ে সেই প্রাচীন অত্যাচারের স্মারক দেখেছিলাম। তার

আগে দেখেছিলাম একটি পরিব্যাপ্ত বিকেল-স্বচ্ছতা যেখানে অংশুময় আমাকে নিয়ে দাঁড় করাল। সামনে এমন একটা পুকুর ছিল যা জলময় ও স্নেহভাজন। একজন অবগাহন স্নান করছিলেন। সমস্ত জায়গাটা তাঁর অবাধ উচ্চারণে ভরে উঠেছিল :

ন জানামি দানং ন চ ধ্যান-যোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র-মন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি॥

আমরা তাঁর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিলাম।—কাকে খুঁজছেন!

—পিসিমা আছেন?

—একটু আগে এখান দিয়ে যেতে দেখেছি। দেখুন তো ঘরে আছেন কিনা। অংশুময় আমাকে নিয়ে বড়ো উঠোন পার হচ্ছিল। তখনই সে পিসিমাকে পেয়ে যায়। এক বৃদ্ধা কুঁজো হয়ে লাঠি ভর দিয়ে প্রসারিত বারান্দার একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিলেন। তাঁর খোলা চুলে তখনও ছিল দৈর্ঘ্য এবং প্রাবল্য। অংশুর ডাকে তিনি থেমে ধীরে ধীরে পেছন ফিরলেন।—কে?

—আমি অংশু, পিসিমা। আমার বন্ধু নালীককে নিয়ে এসেছি।

—ভালো করেছ। তোমরা আমার ঘরে গিয়ে বোসো। আমি আসছি।

একটি পুরনো ঘরের সমস্ত জানলা খোলা ছিল। কোনো এক জানলার পাশে মেঝেতে বিছানা এত ছোটো করে পাতা ছিল যে যখন-তখন হাতে নিয়ে চলে যাওয়া যায়। সমস্ত ঘরের এক কোণে যে সংকোচময় শয্যা তাকে ঘিরে দু-একটা কৌটো ছিল। এ-ছাড়া আর কোথাও কোনোরকম জিনিসপত্র দেখিনি। তিনি লাঠি ঠুকে ঠুকে ঘরে ঢুকলে আমরা তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি তাঁর হাত আমাদের মাথায় রেখেছিলেন এবং বিছানায় গিয়ে বসেছিলেন। খুবই কম সংলাপ আমাদের

মধ্যে এসেছিল। যতদূর মনে পড়ে তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। নাম কার রাখা তাও তাঁর প্রশ্নের মধ্যে ছিল। এবং উঠে আসবার আগে এমন একটা সময় এসেছিল যখন কোনোপক্ষ থেকেই কোনো শব্দ আসেনি। আমরা বলেছিলাম—আজ তবে আসি, পিসিমা? তিনি বলেছিলেন—এসো। বহু সুকৃতির ফলে মানবতনু লাভ করেছ। একে হেলায় হারিও না।

কে খবরটা দিয়েছিল? বোধহয় পাড়ার ওষুধের দোকানের নিখিল। আমি তখন তেমন-তেমন খবর পেলে ছুটতাম। এক্ষেত্রেও ছুটেছিলাম। শহরের সবচেয়ে বড়ো ফুলের বাজারের কাছে শত শত মানুষ বসে-ছিলেন। এঁদের লক্ষ্য এক, কিন্তু পথ আলাদা। এঁরা জলপথে দূরে চলে যাবার জন্য জলযানের অপেক্ষায় ছিলেন। বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মত ও পথের অংশীদারেরা দলবদ্ধ হয়ে বসেছিলেন। এক জায়গা একেবারে ঘিরে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সেই আবেষ্টনীর মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেবলমাত্র কৌপীনধারী ও ভস্মাচ্ছাদিত। কোথাও গভীর কালো পোশাক পরা পাঁচজনের একটি ছোট্ট উদ্ভাস রচিত হয়েছিল। আবার কোথাও জটান্বিত কিছু শরীরের সঙ্ঘবদ্ধ উপবেশন ছিল। আর একটা দিক ছিল যেখানে কিছু মানুষ বসেছিলেন যাঁর যাঁর ব্যক্তিগত মুদ্রায়। সেখানে কোনো গোত্র চেনার উপায় ছিল না। আমি কোথায় কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে ঠিক বুঝতে না পেরে একদিক থেকে অন্যদিকে বিশৃঙ্খল। দেখছিলাম কোনো কোনো অগ্নিকুণ্ড। গৃহস্থেরা নির্ভয়ে এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে ফোঁটা নিচ্ছে। উপবিষ্টদের কাউকে কাউকে আলু পুড়িয়ে খেতে দেখা যাচ্ছিল। আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে দিকটাতে ঠিক সঙ্ঘ নেই, ব্যক্তিগত সব উপবেশন আছে সেদিকের একজন হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছেন। তক্ষুনি সেখানে না গিয়ে অন্যদিকে ইচ্ছে করেই চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় সেই একই হাতছানি দেখে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি ইশারায় তাঁর পাশে আমাকে বসতে

বললেন। আমি বসতে যাচ্ছি, অত্যন্ত অনুচ্চ স্বরে নির্দেশ পেলাম—'চপ্পল খোলো।' চটি খুলে তাঁর পাশে বসে আছি। কোনো কথা নেই, কোনো বিচলন নেই। আধুনিক পোশাকের এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ চেহারার একজন এসে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন।—'আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' তাঁর প্রশ্নের মধ্যে জালের ওপারে টেনিসবল পাঠানোর তৃপ্তি ছিল। যাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি বিন্দুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে অন্যমনস্কভাবে এবং নির্ভার হাসির সঙ্গে উত্তর দিলেন।—'ইয়হ্ তো এক সেন্‌স্ হ্যায়।' প্রশ্নকর্তা স্থান ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু আমি কিছুক্ষণ বসেছিলাম। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বাঁদিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম আমার থেকে ঠিক তিন-চার হাত দূরে বিশাল গঙ্গা। সেদিন খোলা আকাশের নীচে গঙ্গার পাশে এবং মৌনের পাশে মাটিতে বসে বসে কিছু না বলে উঠে আসার মধ্যে আমি কিছু মাতৃভাষা পেয়েছিলাম।

গত বছর দিদির বাড়ি কদিন ছিলাম। ফেরার পথে আমাদের ট্রেনের কামরায় একটি ছোটো মেয়ে বাঙ্কে উঠে রাত কাটানোর বায়না ধরেছিল। সে যে বাঙ্কটা চাইছিল সেখানে আমার রাত কাটানোর কথা ছিল। তার মা-বাবার সম্মিলিত নিষেধও তাকে নিরস্ত করতে না পারায় আমি নেমে এসে তাকে উঠিয়ে দিয়েছিলাম। অবশেষে সে খুশি হয়ে হাসতে পেরে-ছিল। আমি তার হাসি দেখে নীচে জানলার কাছে তার বাবার কাছে গিয়ে বসেছিলাম। এবং রাত গভীর হয়ে উঠছিল। আমি যে কখন তন্দ্রাস্থ হয়েছিলাম জানি না। মেয়েটির বাবার ডাকে শেষ পর্যন্ত চোখ খুলে যায়।—ও মশাই, যমুনার ওপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে, দেখুন, দেখুন। দেখলাম। ঘাটে নৌকো বাঁধা রয়েছে। প্রতিটি নৌকোর নিজস্ব আলো ফুটে ফুটে সেই অনাহত জলরাশির ওপর রাত্রির দরবার দেখিয়ে দিয়েছিল নীরবে।

শুধু অফিসেই নয়, প্রতিদিন সন্ধ্যের ঠিক পরেই যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যাব নিজেও ঠিক বুঝতে পারি না, তখন এই ধরনের

কয়েকটি নীরবতার স্মৃতি আমাকে পা ফেলে এগিয়ে চলার সামর্থ্য যুগিয়ে যায়। কখনও কখনও কারও কাছে বা কারও বাড়িতে না গিয়ে যে পথ-গুলিকে জ্ঞান হবার পর থেকে দেখে আসছি সেগুলির পরিমণ্ডলে ডুবে যাবার ইচ্ছে হয়। বাড়ির পেছন দিকে এমন কয়েকটি পথ আছে যা এত রূপান্তরের যুগেও রূপে রয়ে গেছে। সেসব পথ দিয়ে হাঁটলে এখনও বিস্ফারিত বরাহদের আপনমনে রাস্তা পার হতে দেখা যাবে! এদের যারা পালন করে তাদের বড়ো বড়ো বস্তি দেখা যাবে। আর বস্তির শুরুতে এবং পথের পাশে এমন একটা ছোট্ট ঘর দেখা যাবে যা আমি কখনও খোলা দেখিনি। ঘরের ওপরে ভুল বানানে কোনোমতে ঘোষণা করা হয়েছে যে কেউ তাজা শূকরমাংসের সন্ধানে থাকলে সে এই ঘর থেকে তা ঠিক পেয়ে যেতে পারবে। কয়েকদিন আগে সকালবেলায় এই রুদ্ধ ঘরের দরজায় আমি স্বচক্ষে শোণিতচিহ্ন দেখে গিয়েছিলাম। বহু পুরোনো বিবাদের সূত্র ধরে ঠিক এই ঘরের সামনে একটি ছেলেকে শেষ করা হয়েছিল। হত্যাস্থলের পেছন দিকে একটু যদি কেউ এগিয়ে যায় তবে সে জলের যে গলিটাকে দেখবে তাকে আজও গঙ্গার মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। তাকে আমি যখনই দেখি তখন আমার একবার করে দিদিমার কথা মনে পড়ে যায়। দিদিমা চিরকাল এমন একটা অঞ্চলে থেকে জীবন কাটিয়ে দিয়ে গেছেন যার খুব কাছে যে আপূর্যমানতা ছিল তাকে শহর-গঙ্গার শ্রেষ্ঠ বিস্তার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আমি বহুদিন তাঁর সেই বড়ো গঙ্গাস্নান দেখেছি। আমাকে পেলে তিনি আমার হাত ধরে সাবধানে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেতেন। আমি তেল মাখতে মাখতে বহু দূরে স্টীমার দেখতে পেতাম। আর ঘাটের কাছেই থেমে থাকা নৌকোগুলির ভেতরে চলত রান্নার আয়োজন। দিদিমা আমাকে তেল মাখাতে মাখাতে তাঁর বহু বান্ধবীর সঙ্গে প্রাত্যহিক কথাবার্তা সেরে নিতেন। মনে আছে আমাকে ঘাটে দাঁড় করিয়েই দিদিমা মামার বিবাহের প্রাথমিক পর্ব শেষ করেছিলেন। এখানে দাঁড়িয়েই তিনি ভাবী পুত্রবধূর সন্ধান পেয়ে যান। আমাকে স্নান করানোর আগেই দিদিমা তাঁর ডুবস্নান একবার করে

রাখতেন। তারপর শুরু হত আমাকে হাত ধরে টেনে নামানোর মতো কঠিন কাজ। আমার ডুবে যাবার ভয় আর আমাকে তিনবার ডুবিয়ে আবার তিনবার তুলে নেবার জন্য দিদিমার প্রযত্ন অনেকক্ষণ ধরে ঘটে যেত। দিদিমা আমাকে ডুবিয়ে আবার তুলে ধরে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এমন এক মুহূর্তের কথা বলতে গেলে তাঁর একটি বাক্যের কথাও বলতে হয়। তিনি সান্ত্বনাদানে ব্যস্ত থেকে বলেছিলেন—'তুই গঙ্গার কাছে সাহস যাচ্ঞা কর। তা-লে তোর এত ভয় কেটে যাবে।' আমি স্নান সেরে সিঁড়িতে বসে দিদিমার স্নান দেখতে দেখতে প্রশ্ন করেছিলাম—'দিদিমা, যাচ্ঞা মানে কী?' দিদিমা বিস্ময়ের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন —'তুই নাকি পরীক্ষায় ভালো ফল করিস। আর যাচ্ঞা মানে জানিস না।' সেদিন ফেরার পথ দিদিমার তিরস্কারে পূর্ণ ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় বাড়ির পাশের এই জলধারা ছোটো হলেও প্রাণবন্ত ছিল। ছিল না এখনকার মতো শুধুমাত্র কলুষে আবদ্ধ। চূড়ামণিযোগে এই গঙ্গার দুপাশে ভিখারিরা বসেছিল। দিদিমা সেবার আমাদের বাড়িতে ছিলেন। তিনি এক কৌটো খুচরা পয়সা নিয়ে আমার সঙ্গে বিকেলবেলায় এই ছোটো গঙ্গার দিকে যেতে যেতে ডাইনে বাঁয়ে পয়সা রেখেছিলেন। আমাকে নিয়ে ডুব দেবার সময় তাঁর সমস্ত মুদ্রায় ফুটে উঠেছিল বৃহতের প্রতি অর্পিত অনুরাগ। তিনিই প্রথম সক্রিয়ভাবে আমাকে প্রতীকের মূল্য দেখিয়ে দিয়ে যান। জলের গলির পাড় ধরে যেতে যেতে নির্ভয়তা যাচ্ঞা করি গঙ্গার কাছে।

জলরেখা ধরে চলে যাওয়া যায় বহুদূর। বুবুন এই জলরেখা ধরে একদিন দৌড়েছিল। তার দুপাশ দিয়ে চলে যায় গুলি। আমি যখন এই জলরেখা ধরে হাঁটি আমি জানি বাইরের কোনো বিপদ নেই। জলরেখায় হয়তো একটাই নৌকো, কিন্তু জলপথের তুলনায় এত বিস্তৃত যে মনে হয় দু পাড় জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেন যে অপেক্ষা করে জানি না। তবে কি মাঝি মাঝে মাঝে এসে দেখে যায় এমন কিছু যা না দেখলে তার বড়ো বড়ো জলযাত্রা শূন্য হয়ে যেতে পারে? কিছুদূর হেঁটে গেলে ঘাট

পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। প্রথম ঘাটে সাধারণত শাঁখা ভেঙে ভাসিয়ে দেবার প্রচলন আছে। শাড়ি ছেড়ে থান পরে উঠে আসার দৃশ্য আছে। দ্বিতীয় ঘাটে ডুব দিয়ে উঠে পুরুষ সবকিছু ছেড়ে ধুতি পরে। গলায় ধড়া ঝুলিয়ে অনমনা হয়ে বাড়ির পথ ধরে। তৃতীয় ঘাটের মাথায় মাটির মেয়ের কোলে মাটির পুরুষ শুয়ে আছে। সধবারা দল বেঁধে এসে এই মাটির মেয়ের মাথায় থোকা থোকা সিঁদুর দিয়ে চলে যায়। মাটির পুরুষও চর্চিত হয়ে উঠেছে ঝরে-পড়া সিঁদুরের সামর্থ্যে। শুধু কি এই-টুকু? শুধু কি মৃন্ময়ীর কোলে বসে আছে মৃন্ময়? আর কিছু নয়? দিদিমা আমাকে প্রতীকের মূল্য দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই এই পৃথিবীতেই চিন্ময়-চিন্ময়ীর সহাবস্থানের কথা মনে পড়ে যায়। এই পৃথিবীকে বাদ দিয়ে কোনোরকম বাদানুবাদে যাবার ইচ্ছে যেন শেষ হয়।

হাঁটতে হাঁটতে কখনও কখনও ইমারতের মধ্যে চলে যাওয়া যায় সহজে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙে সর্বোচ্চ তলায় উঠে গেলে বৈষ্ণবশাসিত গ্রন্থাগার। প্রায় জনহীন। প্রথমদিন আমি গ্রন্থের বহু স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে সমৃদ্ধির গন্ধ পেয়েছিলাম। তখনই তো শুরু হয়েছিল নীচের অন্তত দুটি তলায় সংকীর্তন। সেই শব্দ সর্বোচ্চ তলায় উঠে এলে আমি ধীরে ধীরে মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকধারী এক প্রবীণের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম—এখানে বই পড়তে গেলে কী করতে হবে?

—তেমন কিছু করতে হবে না। একটা ফর্ম দেব, সেটা পূরণ করতে হবে। তারপর তাক থেকে বই নামিয়ে এখানে বসে পড়তে পারবেন।

কথা শেষ করে আবার আমি গ্রন্থ থেকে গ্রন্থের কাছে গিয়ে গিয়ে সমৃদ্ধির মাপ নেবার চেষ্টা করেছিলাম কিছুক্ষণ। তখনও সংকীর্তন চলছে। শব্দের ঊর্ধ্বে উঠে আসার বিরাম নেই। এক সময় লম্বা টেবিলের ওপর পড়ে থাকা কিছু স্মারক-পত্রিকা উলটে দেখে নিলাম। এইভাবে কিছু সময় কাটিয়ে পরিচালকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি কিছু একটা টাইপ করছেন। টাইপ করতে করতে আমাকে আবার দেখে ফেলতে তাঁর আটকায়নি।—আপনি কিছু বলবেন? জ্ঞাতব্য কিছু থাকলে

নিশ্চয়ই বলবেন।

—আমি এখানকার সভ্য হতে চাই। আমাকে সেই ফর্ম দিলে আমি এখনই যা লেখার লিখে দিতে পারি। খুব ভালো ভালো বই আছে। আমি আর দেরি করতে চাই না।

—শুনুন, আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। ফর্ম কিন্তু চাইলেই আমরা দিই না। আপনি নিয়মিতভাবে কিছুদিন এখানে আসুন। টেবিলের ওপর যেসব পত্রিকা আছে ওগুলি পড়তে থাকুন। আমাদের বুঝতে দিন যে আপনি সত্যিই আগ্রহী। তা না হলে তো ফর্ম দিতে পারব না।

আমি লজ্জিত হয়েছিলাম।—আচ্ছা, আজ তাহলে আসি?

—আসুন। তবে অনুরোধ, মাঝে মাঝে আসবেন কিন্তু। দেখবেন ভালো লাগবে। আনন্দ পাবেন। মনকে আমরা ঠিকমতো খাদ্য দিতে পারি না। এখানে মনের খাদ্য পাবেন। কিছুদিন আসুন না, ফর্ম পেতে অসুবিধে হবে না।

ছেলেবেলায় যেখানে খাটাল দেখেছি এখন সেখানে যে ইমারত উঠে গেছে তাতে আশিটি পরিবার বাস করছে। ভেতরে ঢুকতে গেলে দরোয়ানের প্রশ্নের জবাব দিতে হতে পারে। দরোয়ান পেরিয়ে লিফট। সেখানে সব সময় মানুষ থাকে না। নিজেকেই বোতাম টিপে সাততলায় চলে যেতে হয়। আমার কলেজ-জীবনের এক অধ্যাপক এই বাড়ির সাততলায় চলে এসেছেন। এই বাড়িতে আসার আগেই তাঁর স্ত্রী আমাকে স্নেহভাজন করেছেন। বহু পাখির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—জানো নালীক, জীবনে অন্তত একটা দিক খোলা রাখতে হয়।—তাঁর কাছে বহু পাখির নাম আমি প্রথম শুনেছি। তিনিই আমাকে প্রথম বলেছিলেন, ডোডো পাখি মানে অবসান। তাঁর ফুটফুটে মেয়ের গা থেকে জামা খুলতে খুলতে তিনি একদিন আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। পাঁচ বছর আগে আমাদের বাড়ি থেকে মার প্রিয় টিয়াটি উড়ে যায়। বাড়ির যেসব কাজ মা ছাড়া

হবে না। মা সেসব সেরে ফেলে টিয়াটিকে নিয়ে বসতেন। তাকে মানুষের ভাষা শেখানোর জন্য তাঁর অক্লান্ত সব প্রয়াস ছিল। কেউ খেয়াল করেনি, খাবার দেবার সময় বা স্নান করানোর সময় কখন যে খাঁচার দরজা খোলার পর বন্ধ করার কথা ভুলে যাওয়া হয়েছিল। উৎপিঞ্জর হবার এই সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ টিয়া খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথমে খাঁচার ওপরে বসেছিল। অপর্ণা দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ছুটে যায়। তখন সে উড়ে ঘরে এসে বসে। অপর্ণার ঘরে যেতে দেরি হয়নি। কিন্তু সে তখন ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে গেছে। আড়ষ্ট ডানা থেকে মুক্ত পক্ষে নীলিমার দিকে। মা খুব ভেঙে পড়েছিলেন। আমি খাঁচা সাবধানে রেখে নতুন পাখির সন্ধানে ছিলাম, যদিও পরাধীনতার অভিষেক নিয়ে নিজস্ব অপরাধবোধ ছিল। তখন বউদি দু-একটা পাখির নাম করেছিলেন।—জানো, এসব পাখি খাঁচায় থাকতে ভালোবাসে। তা ছাড়া খাঁচায় তাদের বংশবিস্তার হয়।—মাঝে মাঝে সাততলায় গিয়ে পড়লে বউদিদের দরজার সব জটিলতা দেখে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, তাঁরা ভিতরে আছেন নাকি বাইরে বেরিয়েছেন। মাঝে মাঝে তাঁরা ভিতরে থাকলেও দরজায় তালা লাগানোর ব্যাপারটা থাকেই থাকে। কী যে অস্বস্তিতে পড়ি। ভ্রমরের মতো কালো ঘণ্টাটি টিপব কি টিপব না—এই চিন্তায় কিছু সময় যায়। একই অস্বস্তিতে পড়ে যাই আজকাল জয় যখন জিজ্ঞেস করে—বাবা, জয় মানে কী? 'জয়' মানে কি এগিয়ে যাওয়া বলব, নাকি দু হাত ভরে কিছু পাবার কথা বলব, নাকি বলব জয় মানে একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়া, আমি কিছুতেই কিছু বুঝতে পারি না। বউদি ঘরে থাকলে আমাকে তাঁর বুদ্ধিমতী মেয়ে ও তার পড়ার বইয়ের পাশে বসিয়ে রান্নাঘরে চলে যান। কাজের মেয়েটিকে নির্দেশ দিয়ে ফিরে আসতে বেশি সময় খরচ হয় না। এবার তিনি আমাকে মেয়ের কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে বারান্দায় এনে বসান। বারান্দায় চা আর খাবার আসে। তিনি সামান্য কিছু চানাচুর নিয়ে চানাচুর, বিস্কুট আর শোন-পাপড়ির ডিশ আমার দিকে ঠেলে দিয়ে চুমুক দেন আর প্রশ্ন রাখেন।

—নতুন কিছু লিখেছ ? তোমার দাদা বলছিল তুমি কোথাও যাও না, কারও সঙ্গে যোগাযোগ কর না, এভাবে কিছু হওয়া কঠিন। ছুটির সকালগুলো তুমি কাজে লাগাতে পার। যাদের কাছে গেলে কাজ হয় তাদের কাছে যেতে পার।

আমি হয়তো সাততলার বারান্দা থেকে পথ আর খচিত নক্ষত্র কেমন তা দেখে নিয়ে চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে লক্ষ্য করি, বউদি আলখাল্লার মতো এমন একটা পোশাক পরে বসে আছেন যার নাম আমি ঠিক জানি না, কিন্তু যার প্রয়োগ স্টল আলো করে ছড়িয়ে থাকা বহু পত্রিকার প্রথম পাতায় দেখেছি। বউদি আমাকে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে কখনও ভোলেন না। তিনি নিজেই বোতাম টিপে লিফটকে আহ্বান করতে থাকেন। ঠিক সেই সময় তাঁর মনে পড়ে যায়—তুমি তো অফিসের পরীক্ষাতেও বসছ না। এটা কিন্তু ঠিক নয়। নিজেকে প্রমাণ করা দরকার। আমি লিফটের মধ্যে ঢুকে গেলে হাত নাড়াতে নাড়াতে তাঁর শেষ কথা তাঁর হাসির সঙ্গে বেরিয়ে আসে।—নালীক, একটা কিছু করো।

কোনো কোনো দিন পথ আর ইমারত কোথাও তেমন করে যাওয়া হয়ে ওঠে না। অথচ বাড়িতেও থাকি না। বেরিয়ে পড়ি। হয়তো দুপাশে বহুবর্ণ ভিখারিদের রেখে এমন কোথাও ঢুকি যেখানে ধুতি আর গেঞ্জি পরে মানুষ শিকারের জন্য বহু মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের সামনে পেছনে পাত্রের পর পাত্রে দোকানের পর দোকান জুড়ে সাজানো থাকে হলুদ বর্ণ, নানা আকার এবং এক রকমের মিষ্টি। তারা সমস্বরে আমাকে ঘিরে ধরে বলে ওঠে—ভিতরে যাবেন নাকি ? ভিতরে গেলে আমি একাই ভিতরে যাব, কাউকে নিয়ে কখনোই নয়, এ-কথাটা বোঝাতে কোনো কোনো দিন ভিতর পর্যন্ত চলে যেতে হয়। ভিতরে আমি দেশ আর কালের অনেক পরিচিত মানুষকে পেয়ে যাই। তারা সবাই নানা দিক থেকে এসে একটি ছোটো ঘরের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে তাকিয়ে নত হবার চেষ্টা করে। কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যে ত্রিনয়ন আছে, উদগত জিভ আছে, আছে লোহিত অবস্থান শত শত বছর ধরে। কেন্দ্রবিন্দুর সামনে বড়ো বড়ো

প্রদীপ জ্বলে, ঘণ্টাধ্বনি হয় এবং প্রতিষ্ঠিত মানুষও গলা খুলে গেয়ে ওঠে —'বসন পরো মা।' পেছনে যূপকাষ্ঠ। তার পাশে মোম জ্বলে, কে জ্বালিয়ে দিয়ে যায় দেখতে পাই না। তবে এই সেদিন গিয়ে দেখলাম একজন প্রায় নিঃশব্দে একপাশে বালি আর সিমেন্ট রেখে খুবই মনোযোগের সঙ্গে যূপকাষ্ঠের চারদিক বাঁধিয়ে দিচ্ছে।.

আজ সকালে আমি তখনও বিছানা ছাড়িনি, কিন্তু জয়ও অপর্ণার সঙ্গে উঠে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওকে সবাই মিলে কদিন ধরে বুঝিয়েছে, তুমি ট্রেনে চেপে কু-ঝিক্-ঝিক্ করে সমুদ্র দেখতে যাবে। জয় ভোরবেলায় জেগে গিয়ে মাকে জাগিয়েছিল।—মা, ওঠো ওঠো, কু-ঝিক্-ঝিক্ করে সমুদ্র দেখতে যাবে না?

ঘুমচোখে অপর্ণার বিরক্তি বেশি।—মাম্পি চুপ করে শুয়ে থাকো। আমরা তো বিকেল বেলায় যাব। কী হচ্ছে কী! বিরক্ত করলে তোমাকে নেব না কিন্তু।

জয় তখন মাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমি প্রশ্ন করি—মাম্পি, আমাকে সমুদ্রে নিয়ে যাবে তো?

—না না, তোমাকে নেব না।

—কেন, আমি কী করলাম, আমাকে নেবে না কেন?

—বাবারা সমুদ্রে যায় না। বাবারা সমুদ্রে গেলে ডুবে মরে যায়। বড়ো বড়ো ঢেউ আছে কিন্তু।

এর কিছু পরে অপর্ণা বাধ্য হয়েছিল বিছানা ছাড়তে। জয় তাকে অনুসরণ করে। আমি শুয়ে শুয়ে আলস্যে ডুবে থাকি। তখনই গলির মধ্যে কেউ ঢুকে পড়ে আমার শোবার ঘরের দরজার কড়া নেড়েছিল।

—কে?

—একটু শুনবেন?

জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি এক লম্বা আর সুদর্শন যুবক। সুসজ্জিত এবং শ্মশ্রুল। হাতে ব্যাগ।—আমি কিছু বই এনেছি, একটু

দেখবেন ?

আমি একটু বিস্মিত হয়ে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলাম। ফলে জানতে পারলাম বিশ্বজোড়া একটি দেশের স্থানীয় প্রতিনিধি হয়ে তিনি শিশু আর যুবতীদের জন্য কিছু বই নিয়ে এসেছেন। তাঁকে ভেতরে এনে বসাতে বাধ্য হয়েছিলাম।—আপনার ছেলে যদি ইংলিশ-মিডিয়ামে পড়ে এই বইগুলো তার কাজে লাগবে।

—আমার ছেলে এখনও খুবই ছোটো। আর একটু বড়ো না হলে এসব বই ঠিক কাজে লাগবে না।

—মেয়েদের ওপর কিছু ভালো বই আছে, পত্রিকা আছে। গ্রাহক হলে একটা নতুন ক্যালেণ্ডারও পাবেন। আপনি একটু বউদিকে ডেকে দিলে ভালো হয়।

অপর্ণা বাথরুমে ছিল। বেরিয়ে এলে তাকে বাইরের ঘরে বই দেখতে যাবার কথা বলি। সে চুল বেঁধে পাউডার মেখে শাড়ি পালটে তবে যায়। ফলে বেশ কিছুটা সময় ওই প্রতিনিধিকে বসে থাকতে হয়েছিল একা একা। কিন্তু অপর্ণা ঢুকলে তিনি অক্লান্তভাবে এবং হাসিমুখে কাজ শুরু করে দেন। শোবার ঘরের দরজায় ঠিক তখনই কড়া-নাড়ার শব্দ পেয়েছিলাম আবার।—কে ?

—একটু শুনবেন ?

উঁকি মেরে দেখি গৈরিকে ঢাকা বৃদ্ধ। হাতে বাঁধানো খাতা।

—কিছু সাহায্যের জন্য এসেছি।

—কোথা থেকে আসছেন ?

উত্তরে তিনি যে আশ্রমটির নাম করলেন হিমালয়ের প্রবেশদ্বারে তার নাম কে না জানে ? আমি তাঁকে ভেতরে এসে বসতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি রাজি হননি। বরং রৌদ্রে দাঁড়িয়ে খাতা খুলে অবাধ গতিতে আমার নামঠিকানা আর সাহায্যের পরিমাণ লিখে গিয়েছিলেন।

ট্রেন ছাড়তে কোনো দেরি হয়নি। এই তো কয়েক ঘণ্টা আগে মামা-

মামীর পাশে অপর্ণা আর জয়কে বসিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছি। যে বাসটাতে ফিরি তা বাড়ির মাইল খানেক আগে এসে অন্যদিকে চলে যায়। আমি নেমে পড়ে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। তখনই ট্রাফিক আলোয় দাঁড়িয়ে-থাকা গাড়িগুলোর কোনো একটা থেকে ডাক আসে। —নালীক, কোথায় যাচ্ছ? পেছন ফিরে সঠিক গাড়ির দিকে তাকাতে একটু সময় লাগে। গাড়ির মধ্যে অংশুময়। তার পাশে একটি মেয়ে, কিছুটা স্থূল কিন্তু অনেকটা উজ্জ্বল। আমি বোধ হয় এর কথা কিছুদিন ধরে শুনে আসছি। এত বছর বাদে একে নিয়েই বোধহয় অংশুময় বিন্যস্ত হবার কথা মন দিয়ে ভাবছে।

—বাড়ি ফিরছি, অংশু।

—এসো, উঠে এসো। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।

—এই না না। আমি দু-একটা কাজ সেরে বাড়ি ফিরব।

—গৌরী, এই হচ্ছে নালীক।

দুজনেই হাত জোড় করে হেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করে গাড়ি।

কয়েক ঘণ্টা আগে সোজা বাড়ি ফিরতে পারিনি। মাসিমা বলেছিলেন ফেরার পথে অপর্ণাদের ভালোভাবে রওনা হতে পারার খবরটা দিয়ে যেতে। সুজনদা এখন শহরে নেই। সে এখন পর্বতারোহণে তত ব্যস্ত নয়। বরং পাহাড় থেকে নেমে এসে পাহাড়ের পাদদেশে যারা থাকে সেইসব আদিবাসীর তরুলতা নদনদী এবং জীবন নিয়ে তাকে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। এই তো সেদিন তার প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক রূপায়ণে শহর থেকে অনেক দূরে গিয়ে দু-একজন মন্ত্রীও তাঁদের বক্তব্য বলে এসেছেন। এমন কি প্রকৃতির নানা দিক নিয়ে আলোচনার সূত্রে সেখানে শিক্ষাময় সব শিবিরবাসও ঘটেছিল। শিবির ভাঙার আগে উঁচু টিলায় উঠে আগুন জ্বালিয়ে অন্তত পঞ্চাশজনের একটি দল যে সমস্বরে একটি অঙ্গীকারপত্র পাঠ করেছিল তা আমি শুনেছি। এই অঙ্গীকারপত্র আমাকেদিয়ে লিখিয়ে নেবার সময় সুজনদা বলেছিল—'নালীক, এমনভাবে

লিখবি যাতে স্তোত্র-স্তোত্র ভাব ফুটে ওঠে।' চেষ্টা করেছিলাম।—'আমার উত্তরে আমার দক্ষিণে আমার পূর্বে আমার পশ্চিমে আমার শব্দে আমার নৈঃশব্দ্যে যা বিরাজিত এবং যা বিস্তৃত তারই নাম প্রকৃতি…।'

মাসিমাকে ওদের নিরাপদে ট্রেনে ওঠার খবর দিয়ে শোণিমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।

—শোণি বোধ হয় ছাদে আছে, ছ্যাখো তো।

বহুদিন বাদে ছাদে উঠেছিলাম। শোণিমা এখন পড়া শেষ করে পড়াতে গেলে কী করতে হয় সেইসব পড়া পড়ছে। ছাদের দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে সে ঝুঁকে পড়েছিল।

—পুরোনো বাড়ি, অত ঝুঁকে পোড়ো না, শোণি।

শোণিমা চমকে পেছন ফিরল।

—তুমি কখন এলে?

—এইমাত্র।

—দিদিদের ট্রেন কখন ছাড়ল? মাম্পি কান্নাকাটি করেনি?

তার সমস্ত প্রশ্নের যথাসাধ্য জবাব দিয়ে আমি অনাবরণ মেঝেতে বসে পড়ে আমার প্রশ্নের অবতারণা করার জন্য শোণিমাকে বসতে বলেছিলাম।

—নালীকদা, কী গো তুমি, ওই ধুলোর মধ্যে বসে পড়লে। আমি ওখানে বসতে পারব না। কিছু মনে কোরো না, এখানেই বসে পড়লাম।

শোণিমা আমার থেকে একটু দূরে ছাদের দেয়ালের কাছে কাঠের বাক্সের ওপর বসলেও আমরা মুখোমুখি আসীন হতে পেরেছিলাম।

—শোণি, তোমার সেই বন্ধুর নাম কী ছিল যেন? ওই যে, যে এয়ারপোর্টের কাছে থাকত?

—তুমি সুতপার কথা বলছ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সুতপা। মনে আছে সুতপা তোমাকে একটা ফুলের কথা বলেছিল? খুব সুন্দর দেখতে, খুব সুন্দর গন্ধ। আর কাণ্ডের শরীর ফুঁড়ে ফুলের স্তবক বেরিয়ে আসে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নাগলিঙ্গম। রাজভবনের সামনে নাকি নাগলিঙ্গমের গাছ আছে।

—নাকি নয়, সত্যিই আছে। আমি এই কিছুদিন আগে একটা বইতে এর উল্লেখ পেয়েছি। সরকারি অনুদানে বইটা বেরিয়েছে। বইটার মধ্যে নাগলিঙ্গম-এর কথা বলতে গিয়ে লেখক রাজভবনের কথা বলেছেন।

—সুতপা তখন অনেক খবর রাখত। গত বছর ওর বিয়ে হয়ে গেছে।

—শোণি, এই রোববারে আমার সঙ্গে যাবে?

—কোথায় নালীকদা?

—রাজভবনের সামনে। নাগলিঙ্গম দেখে আসব।

শোণিকে রাজি করাতে একটু কষ্ট হয়েছিল। সে তার স্বাভাবিক এক শারীরিক অস্বস্তির কথা তুলেছিল। বলেছিল কদিন পরে যাবে। কিন্তু আমি আর দেরি করতে চাইছিলাম না। আমার উৎসাহ আমার অসহায়তার দ্বারা রঞ্জিত দেখে শোণি শেষ পর্যন্ত না করতে পারেনি।

রবিবার মানে তো পরশুদিন। পরশুদিন বিকেলে আমি শোণিকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করব। শহর এখন বাইরের দিক থেকে শুধু নয়, ভিতরের দিক থেকেও উত্তপ্ত। হয়তো বাস-রাস্তায় গিয়ে দেখব নানা বয়সের পুরুষ আর নারী পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত যানবাহন বন্ধ। আমরা হয়তো তখন বাসের চলমানতার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে না থেকে হেঁটে কিছুটা এগিয়ে যেতে চাইব। মিছিলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে কিছুদূর গিয়ে আমরা কোনো পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে পরবর্তী বাস-রাস্তা সংক্ষিপ্ত করতে চাইব। তখন কোনো অশ্বারোহী পাড়ার মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার মাঠের দিকে যদি এগিয়ে যেতে থাকে তবে ছোটো ছোটো ছেলেরা ঘোড়াকে বিভ্রান্ত করার জন্য হাততালি দিয়ে যেতে থাকবে। আর সেই অব্যাহত শব্দের পটভূমিতে কোনো গাজনের সন্ন্যাসী তার থালা পেতে কোনো দোতলা থেকে নিক্ষিপ্ত মুদ্রা সংগ্রহ করে নেবে ঠিক। আমাদের এই যাত্রাপথের প্রথম পর্ব বাধায় সমাচ্ছন্ন হলেও হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্বে নিশ্চিত থাকবে ঋতুমতী

কুমারীর উচ্ছ্বাস—এই তো তোমার নাগলিঙ্গম! এই তো নালীকদা!

আর রাজভবনের সামনের সেই গুহ্য উজ্জ্বলতার কথা ভেবে আমার এই রাত্রিজাগরণের মধ্যে সত্যিই কি কোনো ক্লেদ থাকতে পারে?

সমাপ্ত